আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ একাদশ সংখ্যা
১-১৫ জুন ২০১৯ ১৬-৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

মূল্য : ২০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com
সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ একাদশ সংখ্যা ১-১৫ জুন ২০১৯,
১৬-৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
Vol. 7, Issue 11th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ ছবি: মনোজ দত্ত

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা
বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয়
সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের রায় ৫
বাংলার আকাশে গৈরিক মেঘ! ৮

সমসাময়িক
পরাজয়, তবু গৌরবের ১২
'এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না' ১৩
ইরান নিয়ে সাজ সাজ রব ১৪

ভাঙারে জোড়া দেবে সে?
অর্ধেন্দু সেন ১৭

বাম বিপর্যয়
শুভনীল চৌধুরী ১৯

নির্বাচনোত্তর পর্ব ও কিছু কথা
সুজিত পোদ্দার ২৪

১৪ মে ২০১৯ : জ্ঞানের বিহনে...
সুমন ভট্টাচার্য ২৮

মোদী সরকার ও সমন্বয়ী ভারত
গৌতম রায় ৩১

জালিয়ানওয়ালাবাগ ১৯১৯
সোমশঙ্কর সিংহ ৩৪

অন্য রকম পূর্ব এশিয়া
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী ৩৯

বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা : ২
অভিজিত গুহ ৪৭

চিঠির বাক্সো ৫২

পুনঃপাঠ
এবার গাত্রোত্থান করুন ৫৪

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের রায়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত। ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয় বার দিল্লির মসনদে ক্ষমতাসীন। তাদের পক্ষে যে পরিমাণ মানুষের সমর্থন রয়েছে তা স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। গোটা দেশে মোট ৩০৩ আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে, যা ২০১৪ সালের ২৮২ আসনের থেকে ২১টি বেশি। ২০১৪ সালে বিজেপি গোটা দেশে মোট ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, এই নির্বাচনে তারা ভোট বাড়িয়ে ৩৭.৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এনডিএ জোট ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে ৩৫২টি আসনে। কংগ্রেস দল মাত্র ৫২টি আসনে জয়ী হয়েছে।

এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবণতার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। প্রথমত, বিগত মোদী সরকারের উন্নয়নের কাজের ফিরিস্তির দিকে তাকালে আমরা দেখব যে ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে বিজেপি যেই প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, তার কিছুই তারা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তাই এই নির্বাচনে বিজেপি উন্নয়নের কথা না বলে জাতীয় সুরক্ষা, জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্বকেই তাদের প্রচারের মুখ্য বিন্দু করে। মানুষ বিজেপিকে এই বিষয়ে ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনে বিজেপি দল নয়, মুখ্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমগ্র ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। দেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা জনপ্রিয়তার সূচকে মোদীর ধারে-কাছেও পৌঁছোতে পারেনি। তৃতীয়ত, বিজেপি বর্তমানে ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। হিন্দি বলয়ের মধ্যে তাদের চিরাচরিত জনভিত্তিকে ছাপিয়ে বিজেপি দক্ষিণ ভারত (কর্ণাটক ব্যতিরেকে) বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি রাজ্যে অভাবনীয় সাফল্য হাসিল করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের নির্বাচনী সাফল্য চমকপ্রদ। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ দশকের কংগ্রেস যেমন সামগ্রিক ভারতের প্রধান জাতীয় দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিজেপি অনুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের

রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যেখানে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত স্তরে মূল কর্তৃত্ববাদী পার্টি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চতুর্থত, হিন্দি বলয়ে তাদের চিরাচরিত জনভিত্তিকে বিজেপি এই নির্বাচনে ব্যাপকভাবে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। গুজরাতে ৬২ শতাংশ, হরিয়ানায় ৫৮ শতাংশ, হিমাচল প্রদেশে ৬৯ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৫৮ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৫১ শতাংশ, ছত্তিশগড়ে ৫১ শতাংশ, রাজস্থানে ৫৮ শতাংশ, বিহারে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীরা। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে তিনটি রাজ্য— রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়-এ তারা সদ্য বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়। তবু, কয়েক মাসের ব্যবধানে হিন্দি বলয়ে বিজেপি-র এই ব্যাপক জনসমর্থন বৃদ্ধি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

তিনটি রাজ্যের নির্বাচনী পরাজয়ের অনেক আগে থেকেই বিজেপি ভারতের জনগণের সামনে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক আখ্যান নির্মাণ করে যাচ্ছিল। একটি আখ্যান উন্নয়নের, অন্যটি হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদের। নতুন মোড়কে জাতীয়তাবাদের রাজনীতি নরেন্দ্র মোদী তথা অমিত শাহের দান। আগে বিজেপি সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের রাজনীতি করলেও, জাতীয়তাবাদ তাদের রাজনৈতিক আখ্যানে হিন্দুত্বের ছায়ায় ঢেকে যেত। অমিত শাহ এবং মোদী জাতীয়তাবাদকে একটি মতাদর্শ হিসেবে মানুষের সামনে রাজনৈতিকভাবে হাজির করে। অবশ্যই সেই মতাদর্শের ভিত রয়েছে হিন্দুত্বের ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক আগ্রাসনে। কিন্তু তা যে ভিন্ন, তা নিয়েও কোনো সংশয় নেই। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই বিতর্ক বিজেপি মানুষের সামনে হাজির করে তা ভারতের জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝা উচিত তা নিয়ে। সেখানে প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে বার করা মুশকিল। একই সূত্র ধরে সেনাবাহিনী এবং জাতীয় সুরক্ষার রাজনীতি এই জাতীয়তাবাদের রাজনীতির মোড়কে সুচারুভাবে বুনে নেওয়া হয়। এই রাজনৈতিক আখ্যান পুলওয়ামার সন্ত্রাসবাদী হামলার বহু আগে থেকেই বিজেপি-র কাছে মজুত ছিল। কিন্তু পুলওয়ামার সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং পরবর্তী বালাকোটে বিমান হানার ঘটনা বিজেপি-কে সুযোগ করে দেয় জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সুরক্ষার বিষয়টিকে রাজনীতির মঞ্চে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ করার। আবার তাদের উন্নয়নের আখ্যান সাধারণ মানুষের কাছে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, তার প্রমাণ তারা পেয়েছিল তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। তাই তারা তাদের দুটি মুখ্য আখ্যানের একটি উন্নয়নকে সরিয়ে জাতীয়তাবাদের আখ্যানকে কেন্দ্র করে ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শগত, সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক দৈন্য ফুটে ওঠে এই সন্দর্ভেই। প্রথমত, উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের মতন বিষয়গুলিকে নিয়ে পাঁচ বছর বলার মতন কোনো আন্দোলন বিরোধীরা করেননি। শুধুমাত্র নাসিক থেকে মুম্বই কৃষকদের অসাধারণ মিছিল এই দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য যথেষ্ট ছিল না। নোটবন্দি, জিএসটি, পেট্রো-পণ্যের বাড়তে থাকা দাম, বেকারত্ব, কৃষি সংকটের মতন বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক বিবৃতি দেওয়া বাদে কোনো গণ আন্দোলন বিরোধীরা গড়ে তুলতে পারেননি। এমনকী সরকারে এলে তাঁরা কোন নীতিসমূহ গ্রহণ করবেন, তার কোনো দিশা বিরোধীরা দেখাতে পারেননি। *আরেক রকম*-এর এই কলামে আমরা বিরোধী রাজনীতির এহেন দুর্বলতার কথা বহু বার তুলে ধরেছি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে মানুষ এইসমস্ত অর্থনৈতিক সংকটের ঠেলা সামলাতে না পেরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে রায় দেবেন। কিন্তু তা হয়নি কারণ, একদিকে বিজেপি নির্বাচনের বিতর্কটিকে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সুরক্ষার দিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে বিরোধীদের কর্মসূচিগত অস্বচ্ছতা মানুষের মনে ভরসা জাগাতে পারেনি। এমনকী, মোদী সরকারের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার বিষয়গুলিকেও বিরোধীরা নির্বাচনের মুখ্য ইস্যু বানাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সুরক্ষার বিতর্কে বিরোধীরা থতোমতো খেয়ে গেছেন। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশদের পদলেহন করেছে, সেই আরএসএস-এর কাছে জাতীয়তাবাদের বিতর্কে গোহারা হারার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে কংগ্রেসের লজ্জা হওয়া উচিত। গোটা প্রচারে কোনো বিরোধী দলের নেতার মুখে এই কথা শোনা গেল না যে আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে গদ্দারি করেছিল। পুলওয়ামার ঘটনার পরে রাহুল গান্ধী সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করে দিলেন যে সরকার যা পদক্ষেপ নেবে তার দলের সমর্থন থাকবে। একবারও এই প্রশ্ন তুললেন না, কেন এমন সন্ত্রাসবাদী হামলা হল? মুখ্য সুরক্ষা আধিকারিকের পদত্যাগ দাবি করলেন না, দাবি তুললেন না যে এই পরিস্থিতিতে সরকারের কী করণীয় তা সর্বদলীয় বৈঠক করে ঠিক করতে হবে। বিরোধিতাহীন জাতীয় সুরক্ষার বিতর্কে মোদী পাকিস্তানের উপর বিমান হামলা চালালেন।

ততদিনে জাতীয়তাবাদের পারদ চড়ে গেছে, তারপরে প্রশ্ন করা যে কতজন উগ্রপন্থী নিহত হল, ইত্যাদি, সেগুলি মানুষের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি।

জাতীয়তাবাদ মানে যে উগ্র মুসলমান এবং পাকিস্তান বিদ্বেষ নয়, এই কথাটা বিরোধী রাজনীতিবিদরা বোঝাতে পারেননি, কারণ তাদের কাছে এই রাজনীতির কোনো বিকল্প আখ্যান ছিল না। তাই মানুষ বিজেপি-র এক তরফা প্রচারকে বিশ্বাস করেছে। সেই প্রচারে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের মতন একজন সন্ত্রাসবাদী হামলায় অভিযুক্তকে প্রার্থী করে জয়ী হয়েছে বিজেপি। বিরোধীরা চিৎকার করেছেন কিন্তু মানুষ তাদের পাত্তা দেয়নি। দেশের মুসলমান সমাজকে ব্রাত্য ঘোষণা করে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার করে গেছেন মোদী এবং অমিত শাহ। একের পর এক পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে, বিরোধীরা কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কোনো বিকল্প রাজনৈতিক আখ্যান খাড়া করতে পারেনি বিরোধীরা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ বিজেপি মানুষের মনে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। অতএব মানুষ বিজেপি-র প্রচারকে বিশ্বাস করেছেন, তাদের ভোট দিয়েছেন।

বিরোধী রাজনীতির এই ব্যর্থতার কারণগুলি গভীর। আপাতত কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। নরেন্দ্র মোদী ভোটের ফলাফল বেরোনোর পরে বিজেপির সদর দপ্তরে ভাষণে একটি কথা বলেন, যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চোর-জোচ্চোরদের আড়াল করার রাজনীতির অবসান হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি মৃত। অবশ্যই তিনি মনে করেন যে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই, স্থান থাকুক তাও তিনি চান না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তা মানুষের মনের কথা। ধর্মনিরপেক্ষ বলে জনগণকে ভুলে যেতে হবে কংগ্রেসের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, ভুলে যেতে হবে মমতার ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি এবং স্বৈরাচার, ভুলে যেতে হবে যে চন্দ্রবাবু নাইডু একজন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সুবিধাবাদী নেতা, ভুলে যেতে হবে লালু, মুলায়ম, মায়াবতীর দুর্নীতি, অপশাসন এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন! ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির নামে এই অত্যাচার মানুষ মানতে রাজি হয়নি। আবার রাফাল কেলেঙ্কারি নিয়ে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগান মানুষ বিশ্বাস করেনি। রাফাল কেনা সংক্রান্ত বিষয়ে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের কঠোর সমালোচনা অবশ্যই প্রাপ্য ছিল। অনিল আম্বানির মতন অসাধু ব্যবসায়ীকে বরাত পাইয়ে দেওয়া ধান্দার পুঁজিবাদের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু বোফর্স কেলেঙ্কারির মতন এই ক্ষেত্রে বেআইনি টাকা লেনদেনের কোনো প্রমাণ বিরোধীরা হাজির করতে পারেনি। জনগণ তাই মোদী চুরি করেছেন এই কথা বিশ্বাস করেনি।

বিরোধীদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে মোদী নিজেকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্যই বিপুল অর্থ, কর্পোরেটদের দ্বিধাহীন সমর্থন, মিডিয়ার ব্যক্তিপুজো, 'ব্র্যান্ড মোদী' নির্মাণ করেছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিকভাবে ব্যক্তি-মোদীর উত্থান গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, মোদী মানুষের সামনে নিজের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসার কাহিনিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। একদিকে রাহুল গান্ধী যিনি শুধুমাত্র তাঁর বংশগত পরিচয়ের জন্য কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। অন্যদিকে মোদী, যাঁর বংশপরিচয় তুচ্ছ, যিনি নিজের হাতে নিজেকে গড়েছেন— এই প্রচার মানুষের মনে দাগ কেটেছে। কারণ সাধারণ মানুষ ভারতের বৈষম্যের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই করে চলেছে। তাদের অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে যে বড়োলোক হলে তার সন্তানের ভালো হয়, কিন্তু গরিব লোকের সন্তান গরিব থাকে। এই প্রবণতার ছাপ দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধী-সহ সমস্ত বংশগত নেতাদের মধ্যে। উলটো দিকে দাঁড়িয়ে মোদী, যার বংশের পরিচয় তুচ্ছ হলেও যিনি প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, একথা জনগণ বিশ্বাস করেছে। আমরা যতই মোদীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে গাল পাড়ি, মানুষের কাছে রাহুল গান্ধীর তুলনায় মোদী অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। বংশগত রাজনীতির প্রায় সমস্ত প্রতিনিধি এই নির্বাচনে ধরাশায়ী। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম-অখিলেশ, অজিত সিংহ ও তার পুত্র, বিহারে লালু-তেজস্বী, হরিয়ানায় হুদা পরিবার, মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, রাজস্থানে অশোক গেহলটের পুত্র, সবাই পরাজিত। স্টালিন তামিলনাড়ুতে জিতলেও বংশগত নেতাদের বিরুদ্ধে মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একথা বলাই যায়। এই প্রবণতা নিয়েও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের ভাবতে হবে। 'নামদার' বনাম 'কামদার'-এর মধ্যে মানুষ যাকে 'কামদার' মনে করেছে তার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

বামপন্থী রাজনীতির গভীর সংকট বর্তমান নির্বাচনের পরে গভীরতর হয়েছে। গোটা দেশে বামপন্থীরা মাত্র ৫টি আসনে জয়ী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটি আসন বাদে বাকি সমস্ত আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে,

ত্রিপুরাতে তারা তৃতীয় স্থানে, কেরালায় মাত্র একটি আসনে তারা জয়ী। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-র হাত ধরে বামেরা কিছু আসন জিতেছে। বাম রাজনীতির সংকট নিয়ে *আরেক রকম*-এর পাতায় আমরা বহু আলোচনা করেছি। বার বার প্রমাণিত হচ্ছে যে এই রাজ্যে বাম নেতৃত্বের আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে নেই। যাঁরা বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গে লাল ঝান্ডাকে ভোট দিয়েছেন তাঁদের একটি বৃহৎ অংশ সদলবলে এই নির্বাচনে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন। রাজ্যে ২০১৪ সালে বামেরা ৩০ শতাংশ মতন ভোট পেয়েছিল, বর্তমানে পেয়েছে মাত্র ৭.৫ শতাংশ। বিজেপি-র ভোট ২০১৪ সালে ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ শতাংশ। নিশ্চিতভাবে তৃণমূলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ বিকল্প বিরোধী শক্তি খুঁজছিলেন। কিন্তু বাম রাজনীতির দুর্বলতা, নেতৃত্বের অপদার্থতাকে এই বলে আড়াল করা যাবে না। জনরায় এই বার্তা দিচ্ছে যে বামেদের তুলনায় রাজ্যের মানুষ তৃণমূল বা বিজেপিকেও অনেক বেশি গ্রহণীয় বলে মনে করেছে। এই লজ্জা বামপন্থা তথা বাম দলের লজ্জা। আমাদের রাজ্যে বামেদের শাসক দল থেকে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার যাত্রার নেপথ্যে রয়েছে নেতৃত্বের আদর্শগত বিচ্যুতি, ঔদ্ধত্য, সবজান্তা মনোভাব এবং প্রবল জনবিচ্ছিন্নতা। আমরা বহু বার বলেছি যে এই নেতৃত্বকে মানুষ আর গ্রহণ করছে না। কংগ্রেসপ্রীতি যারা দেখিয়েছিল, তারা কংগ্রেসের এই নির্বাচনের ফলাফলের পরে কী বলবেন জানা নেই। গোটা বাম আন্দোলনকে আপোশকামিতা, রাজনৈতিক দিশাহীনতা আদর্শহীনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা হারানোর অতল গহ্বরে ঠেলে দেওয়ার জন্য বর্তমান বাম নেতৃত্বের নাম গর্ভাচব, ইয়েলৎসিনদের মতোই ভবিষ্যতের বাম আন্দোলন ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করবে।

মূল বিপদ অবশ্যই দেশের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের। বিজেপি-র মতন একটি ফ্যাসিবাদী শক্তি যখন এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণকে দেশের রাজনীতিতে তুঙ্গে পৌঁছিয়েছে, তখন দেশের সংবিধানকে বাঁচানোই এখন মুখ্য লড়াই। দেশটাকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে বিজেপি তথা আরএসএস আগামী দিনে এই নির্বাচনের ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবাদী মানুষ-সহ সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের উপর আক্রমণ তীব্রতর হবে। একইসঙ্গে শ্রমিক, কৃষক মেহনতি মানুষের উপরে নামিয়ে আনা হবে কর্পোরেটদের নির্দেশিত চাবুক। গণতান্ত্রিক ভারতকে বাঁচানোর লড়াই তাই আরো কঠিন হয়ে গেল। ফলাফল বেরোনোর পরেই আবার শুরু হয়েছে গো-রক্ষার নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। মুসলমান নাম বলে গুলি করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। আমাদের কোমর বাঁধতে হবে, লড়তে হবে। ফ্যাসিবাদকে না হারাতে পারলে ভারতের আর কোনো গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নেই। লড়াই কঠিন, লড়াই অসম, লড়াই দীর্ঘমেয়াদি। তবু এই লড়াই লড়া ব্যতিরেকে আর কোনো পথ নেই। কিন্তু পুরোনো পন্থা, পুরোনো বস্তাপচা রাজনীতি, পুরোনো মুখগুলি এই লড়াইয়ে আগেই হেরে বসে আছে। তাই লড়াইয়ের লক্ষ্যকে অভিন্ন রেখে নতুন রাজনীতি ও পন্থা খোঁজার দায়িত্ব প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকেই নিতে হবে। শুধু আমাদের যেন এই প্রত্যয় থাকে যে এই নির্বাচনী লড়াই আমরা হেরেছি, কিন্তু গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে বাঁচানোর লড়াই আমাদের জিততেই হবে।

বাংলার আকাশে গৈরিক মেঘ!

রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতে বসে মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি আসে যে হতভম্ব হয়ে হাতের কলম হাতেই স্থাণু রেখে দিতে হয়। তখন কী বলা হবে আর পরিস্থিতির ব্যাখ্যা কী দেওয়া হবে, তালগোল পাকিয়ে যায় সব কিছুই। পশ্চিমবঙ্গের ভোটের প্রাপ্ত ফলাফলে বিজেপি-র প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পাওয়া অথবা বামপন্থীদের ৭ শতাংশে নেমে আসা যতখানি বিস্ময়জনক, তার থেকেও বেশি বিস্ময়ের হল, আমাদের আলোকপ্রাপ্ত উদারনৈতিক চিন্তাধারার এতখানি বোকা বনে যাওয়া।

মোটের উপর বলতেই হয় ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে ২০১৯-এ বাংলায় ভোট হয়েছে। দিল্লির সমাজবিজ্ঞানের সংস্থা—CSDS-এর সমীক্ষা বলছে ৫৭ শতাংশ হিন্দুরা বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে, আর ৭০ শতাংশ মুসলমান

তৃণমূলকে। এই ধর্মীয় মেরুকরণ দুশ্চিন্তাজনক। তবু CSDS-এর সমীক্ষা এও বলছে এখনও এই রাজ্যের ৮৪ শতাংশ মানুষ মনে করেন দেশটি সবার, শুধু হিন্দুদের নয়। ধর্মীয় মেরুকরণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে রাজনৈতিক মেরুকরণ, দেখাচ্ছে CSDS-এর সমীক্ষা। বিজেপি সাম্প্রদায়িক তাস অবশ্যই খেলেছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে বাংলার তৃণমূল বিরোধিতা। একটা ছোট্ট তথ্যই যথেষ্ট— ঝাড়গ্রাম লোকসভা ও শালবনী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সুকনাতোড় গ্রামের তৃণমূল নেতা কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ভোটের ফলপ্রকাশের পরের দিনেই। সবাই প্রাণের দায়ে গ্রামছাড়া। অভিযুক্ত বিজেপি। এই আক্রান্ত ও অভিযুক্তরা উভয়পক্ষের সকলেই মুসলমান। সুকনাতোড় গ্রামের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ কি তার বেশি মুসলমান ও হাতে গোনা কয়েক ঘর আদিবাসী পরিবারের বসবাস। গোটা বীরভূম এবং ডায়মন্ডহারবারে বিজেপি-র সংগঠন তৈরি করেছেন যারা, তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ভাঙড়ের মতো মুসলমান প্রধান এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরার ভোট গত বিধানসভার তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। ভাঙড়ের পোলেরহাটে প্রায় একশো শতাংশ মুসলিম, সেখানে বিজেপি এগিয়ে। আপাতত ভাঙড়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম এবং তাঁর প্রতিপক্ষ কাইজার একে অপরের দিকে আঙুল তুলেছেন কে বিজেপি-তে যোগ দেবেন। বাংলায় ভোট হয়েছে মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে। বিজেপি ধর্মের কার্ড খেলেছে, কিন্তু সেটা জায়গা বুঝে। অনেক জায়গাতে মানুষ ভোট দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেবার উদ্দেশ্যে। বিজেপিবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিরা এই বাস্তবতা বুঝতে না চাইলে জনবিচ্ছিন্নতা আরো বাড়বে।

দ্বিতীয় স্টিরিওটাইপিং যেটা করা হয়, বিজেপি একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী দল, যারা উচ্চবর্ণের হিন্দু ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে। বাস্তবটা হল, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যে যে জায়গাতে জিতেছে, সেগুলো একটু পরীক্ষা করলে একটা অদ্ভুত চিত্র উঠে আসে। বিজেপি-র ভোট কিন্তু বিচ্ছিন্ন জায়গাগুলোতে আসেনি। কনসলিডেট করেছে, মানে জমাট বেঁধেছে। সেই জমাট বাঁধার তিনটি অঞ্চল। উত্তরবঙ্গ, মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহল এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি অঞ্চল, যেমন নদিয়া। উত্তরবঙ্গে একটা বিশাল অংশের যে ভোট বিজেপি পেয়েছে, সেটা রাজবংশী, কামতাপুরী এবং অন্যান্য উপজাতিদের ভোট। জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজ তৃণমূলকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিজেপি-কে হাত উপুড় করে ভোট দিয়েছে। নদিয়াতে বিজেপি পেয়েছে মতুয়া এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভোট। মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে শান্তনু ঠাকুর এবার বিজেপি-র সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভোট কোথায় এবং কতটুকু? CSDS-এর তথ্য বলছে দলিতদের মধ্যে ৬১ শতাংশ আদিবাসীদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ এবং অনগ্রসর জাতির মধ্যে ৬৫ শতাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছে। নিম্নবর্গের রাজনীতি তৃণমূল করছে বলে যেই বিদ্বজ্জনেরা পাতার পর পাতা প্রবন্ধ লিখলেন, তাঁরাই-বা কী বলবেন? আর জাতপাতের পরিচিতি-নির্ভর রাজনীতিকে উপেক্ষা করে এই পরিসরে দক্ষিণপন্থীদের জন্য খোলা মাঠ ছেড়ে দেওয়া বামপন্থীদের কাছেই-বা কী জবাব আছে?

তৃতীয়ত, অনেকেই, বিশেষত গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলি এক বাক্যে বলে দিচ্ছে যে বাম ভোটারেরা সকলেই বিজেপি-তে ভোট দিয়েছেন। এটাও অতিসরলীকরণ। অবশ্যই বাম ভোট বিজেপি-তে গিয়েছে, কিন্তু পুরোটা নয়। CSDS-এর সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে বাম ভোটের ৩৯ শতাংশ বিজেপিতে গিয়েছে এবং তৃণমূলে গেছে ৩১ শতাংশ। মুসলমানদের মধ্যে ৩১ শতাংশ মানুষ ২০১৪ সালে বামেদের ভোট দিয়েছিলেন, এবারে দিয়েছেন মাত্র ১০ শতাংশ। CSDS-এর তথ্য থেকে পরিষ্কার বামেদের সংখ্যালঘু ভোট গিয়েছে তৃণমূলে, এবং হিন্দু ভোট গিয়েছে বিজেপি-তে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক স্বীকার করেছেন যে বাম সংখ্যালঘু ভোট এবার তৃণমূলে আসার কারণেই বসিরহাট কেন্দ্রে নুসরাত জাহান এত ভোটে জয়ী হয়েছেন। আবার উলুবেড়িয়াতে বাম ভোট যত কমেছে, তৃণমূল ভোট ঠিক ততটাই বেড়েছে। মনে রাখতে হবে, উলুবেড়িয়াও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্র। অবশ্যই বামপন্থীরা নিজেদের ভোট টিকিয়ে রাখতে অসফল, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। আপাতত এটুক তথ্য থাক যে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর, যেখানে বামেদের অস্তিত্ব দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়, সেখানে আটটি ওয়ার্ডের মধ্যে ছয়টিতে বিজেপি এগিয়ে। তার মধ্যে একটা, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড, মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বাড়ির সংলগ্ন অঞ্চল। সামান্য ক-দিন আগে উপনির্বাচনে চোদ্দো হাজার ভোটে জেতা ৮২ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ১১০০ ভোটে। এই অঞ্চলগুলোতে তো বাম ভোটার নগণ্য। তাহলে বিজেপি এত ভোটে এগিয়ে গেল কাদের সহায়তায়?

এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে বিজেপি দুই পার্টিরই ভোট কেটেছে। তৃণমূলেরটা অত স্পষ্ট নয় কারণ সংখ্যালঘু অংশের একটা বিরাট ভোট তৃণমূলে গিয়েছে।

এবার কিছু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। এই ঘটনার দায় কার? স্বভাবতই, অনেকেই আঙুল তুলছেন বামপন্থীদের দিকে। সিপিআই(এম) কেন অন্তর্ঘাত করল সেই দিকে। কিন্তু কেউ কেন একবারও বলছেন না যে আজ বিজেপি-র এই বাড়বাড়ন্তের অধিকাংশ দায় তৃণমূল কংগ্রেসের? যখন তৃণমূল এসে এই মানুষদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, গ্রামছাড়া বা পাড়াছাড়া করেছে, মাসের পর মাস মানুষজন বাড়ি ফিরতে পারেননি, তাঁদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছে, জেলে ফেলে রেখেছে তখন তাঁদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। সেই মানুষেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে যাকে পেরেছেন তাকেই ভোট দিয়েছেন, এটাই সার সত্য। যখন তৃণমূল গ্রামের পর গ্রাম বিরোধীশূন্য করে দিয়েছে, একের পর এক পার্টি অফিস দখল করে নিয়েছে অথবা ভেঙে দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে শুধুমাত্র লাল পতাকা লাগাবার অপরাধে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছে, সারা বাংলা জুড়ে মাফিয়া আর সিন্ডিকেটের রাজ তৈরি করেছে, স্কুল সার্ভিস কমিশন, টেট, কলেজে ভর্তি— সমস্ত জায়গাতে সীমাহীন দুর্নীতি চালিয়েছে, সিপিআই(এম) সদস্যকে পঞ্চায়েতে ভোট দেবার অপরাধে সস্ত্রীক জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে তারপর পোস্টমর্টেমটুকুও করতে দেয়নি, তখন এই মানুষেরাই লাল পতাকা কাঁধে সম্মুখ সমরে নেমেছিলেন। কিন্তু পার্টি তাঁদের পাশে থাকতে, তাঁদের যন্ত্রণাটুকু বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। আর তার সুযোগ নিয়েছে বিজেপি। সেই সুযোগ করে দেবার দায় যেমন বামেদের, ঠিক তেমনই তৃণমূলের। যখন আসানসোলে বিজেপি-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রামনবমী পালন করতে গিয়ে দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে, যখন সারা রাজ্যে আরএসএস-এর একটার পর একটা অফিস খোলা হয়েছে সরকারি সহায়তায়, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বিজেপি যখন কুৎসিত সাম্প্রদায়িক প্রচার করেছে, তখন তৃণমূল সরকার তূষ্ণীভাব অবলম্বন করে ছিল। ভাবটা ছিল এমন, বিজেপি-কে বাড়তে দিয়ে তাদের মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে আনলে বামেদের আটকানো যাবে। মমতা সম্ভবত সেই প্রবাদটা ভুলে গিয়েছিলেন যে বাঘের পিঠে চড়ে নদী পার হবার পর আর পিঠ থেকে নামা যায় না। বাঘ খেয়ে ফেলে। সরকারর প্রতি সার্বিক ঘৃণার প্রতিফলন এই জনরায়ের মধ্যে নিহিত আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি তা বুঝতে পারছেন?

কেমন সেই ঘৃণার চেহারা? ভোটের পরের দিন থেকে গোটা রাজ্যে যা হচ্ছে, তা হল স্থানীয় রিকশা অটো শ্রমিক ইউনিয়নগুলি রাতারাতি ঘাসফুল থেকে পদ্মফুল হয়ে যাচ্ছে। জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনকী সিপিআই(এম) অবধি তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে নিচ্ছে। দু-দিন আগে মা-মাটি-মানুষ স্লোগান দেওয়া কর্মী সমর্থক, স্থানীয় নেতাদের বিজেপি-তে যোগদান করার হিড়িক পড়ে গেছে। দুঃখের বিষয় একজন বাম বিধায়ক ইতিমধ্যেই বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। সামনের দিনগুলি হয়তো ভয়ংকর, কিন্তু এরকম অ্যাবসার্ড প্রহসন এর আগে বাংলা দেখেছে কি?

সবশেষে আসতে হয় বামেদের প্রসঙ্গে। এই সার্বিক মুখ থুবড়ে পড়বার কোনো ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই, কারণ বাংলার বাম নেতৃত্ব আপাতত জনবিচ্ছিন্ন ও দিশাহীন। কিন্তু বাংলায় বিজেপি-র অভাবনীয় সাফল্যের দায়ভাগ তৃণমূলের পাশাপাশি তাদেরও। তৃণমূলের অপরাধ, তারা অত্যাচার করেছে। বামেদের অপরাধ, তৃণমূলের আক্রমণে বিপর্যস্ত ঘরছাড়া সমর্থকদের পাশে তারা দাঁড়াতে পারেনি। একের পর এক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো বড়ো আন্দোলন খাড়া করতে পারেনি, নিজেদের উপযুক্ত বিরোধী হিসেবে তুলে ধরতে পারেনি। তাসের ঘরের মতো সংগঠন ভেঙে গিয়েছে, বাম নেতৃত্ব চোখ বুজে থেকেছেন। সবথেকে বড়ো কথা, আজ যে দলে দলে বাম ভোটারেরা গিয়ে বিজেপি-তে ভোট দিয়ে এলেন এর রাস্তা কি তাঁরাই প্রশস্ত করে দেননি? ২০১৯ সালের নির্বাচনে রাজ্যের বাম নেতৃত্ব কতটা বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন? মানুষকে বিজেপি-র বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন কি? তৃণমূলের বিকল্প যে বিজেপি হতে পারে না, সেই বার্তা কেন অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর থেকে আসতে হল? বাকিরা কী করছিলেন? গরম কড়াইয়ের আঁচ বুঝলেন আর আগুনের দহন সম্পর্কে সতর্ক থাকলেন না? এরপরেও আপনারা বাম নেতা?

২০১৬ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বাম নেতৃত্ব যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন কংগ্রেসকে তাদের অঞ্চলে ভোট দিতে হবে, তখনই মানুষ বুঝে গিয়েছিলেন যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বামেরা আর উপযুক্ত নয়— তাদের দরকার পড়ছে অন্য কারও সাহায্যের। এবার, ভোটাররা প্রশ্ন করতেই পারেন, কংগ্রেস-কে ভোট দিতে

পারলে বিজেপি-কে কেন নয়? আজ যখন বাংলায় বিজেপি-র কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, ফ্যাসিবাদ, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি প্রশস্ত হচ্ছে, তখনও নেতৃত্ব ঘুমিয়ে আছেন। এই অভূতপূর্ব হার, স্বাধীনতার পর এই প্রথম বামপন্থীরা বাংলায় শূন্য হয়ে গেলেন এবং দক্ষিণপন্থার হাতে ক্রমশ চলে গেল গোটা রাজ্যটাই, এর দায় শুধুই তৃণমূলের? নিজেদের দুর্গ অটুট রাখতে পারল না কেন বামেরা? আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা ইত্যাদি ভারী ব্যাপার অনেক পরে হবে। আপাতত যেটা নেতৃত্ব করতে পারেন, তা হল পদত্যাগ। বাংলা পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে থাকা নেতাদের পদত্যাগের মাধ্যমেই যে আবার দুর্যোগ কেটে যাবে এমনটা নয়। কিন্তু মুখরক্ষার প্রথম ধাপ হতে পারে একমাত্র পদত্যাগই। এই নেতৃত্ব বারংবার ব্যর্থ, এবং যেকোনো সংস্থাতেই ব্যর্থতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে সর্বোচ্চ নেতার সরে দাঁড়ানোটা নিয়ম। বাংলায় বিজেপি-কে আটকাতে পারে কংগ্রেস বা তৃণমূল নয়, একমাত্র লড়াকু, আপোশহীন বামপন্থাই পারবে। কিন্তু সেই ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই লড়তে হলে নেতা ও নীতি, দুইয়েরই বদল আবশ্যিক। বর্তমান নেতৃত্ব এবং তাদের রাজনৈতিক লাইন এই লড়াইয়ের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই পদত্যাগ করুন। পদত্যাগ করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না, কিন্তু অন্তত সমাধান খোঁজা শুরু হবে। আপনারা সমাধান দিতে পারবেন না, কারণ আপনারাও সমস্যা। যদি এটা না করা হয়, বুঝতে হবে বামপন্থীরা যুদ্ধের কৌশল ও নিয়মকানুন বুঝতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

অথবা, হয়তো কোনোদিনই বোঝেননি!

ছবি : ইন্দ্রপ্রমিত রায়

সমসাময়িক/সম্পাদকীয়

পরাজয়, তবু গৌরবের

গোটা দেশজুড়ে বামপন্থীদের বিপর্যয় অব্যাহত। তারমধ্যে কেরল অন্যতম। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক জোট সেখানে লোকসভার ২০টি আসনের মধ্যে মাত্র একটিতে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বাদবাকি ১৯টিই গেছে কংগ্রেসের ঘরে। তবু কেরলকে প্রশংসা করতেই হবে দুটি কারণে। এক, বামেরা ভোটের শতাংশের হিসেবে নিজেদের জনসমর্থন ধরে রাখতে মোটামুটি সক্ষম হয়েছে। দুই শবরীমালা বিতর্কে তারা আদর্শগত অবস্থান গ্রহণ করেছে। শবরীমালা নিয়ে কট্টর বামবিরোধী অবস্থান নেওয়া শশী থারুর তিরুবনন্তপুরমে প্রায় এক লাখ ভোটে জয়ী হয়েছেন। ২০১৪ সালে তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল পনেরো হাজার। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, কেরলে বামেদের এই হারের নেপথ্যে শবরীমালা মন্দির বিষয়ক ঘটনাটি নিয়ন্ত্রক ভূমকা নিল কি না।

থারুরের বিপক্ষে সিপিআই প্রার্থী যিনি ছিলেন, তাঁর ভোট কমেছে গতবারের তুলনায় তিন শতাংশ। অপরদিকে, থারুরের ভোট বেড়েছে সাত শতংশ। এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে শবরীমালা প্রসঙ্গে বাম সরকারের কট্টরপন্থী অবস্থানের কারণেই বামেদের এরকম বিপর্যয়। কিন্তু শবরীমালা ইস্যুতে বামেদের বিরুদ্ধে সবথেকে কট্টর অবস্থানে ছিল বিজেপি। তারা একটা আসনেও জয়ী হতে পারেনি, এমনকী একটি আসন বাদে অন্যগুলিতে দ্বিতীয়ও হয়নি। তিরুবনন্তপুরমে বিজেপি গতবার দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এবারেও তারা দ্বিতীয়, এবং ভোট শেয়ারও কমেছে। তহলে শবরীমালা ইস্যুই যে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।

যেটার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি, তা হল শবরীমালা ইস্যু একটা প্রভাব ফেলেছে অবশ্যই। কিন্তু তার ফসল ঘরে তুলেছে কংগ্রেস, বিজেপি নয়। কংগ্রেস সেটা বুঝেই তীব্র বামবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান নিয়েছিল। কারণ, নায়ার ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দু ভোট নিজের ঝুলিতে সুরক্ষিত করতে হলে প্রগতিশীল অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয়। কংগ্রেস যদি শবরীমালা ইস্যুতে প্রগতিবাদী অবস্থান নিত, তাহলেও সেটা হত বামেদেরই অনুকরণ। তাতে বাম প্রগতিশীল ভোট কংগ্রেসের ঘরে আসত না, উলটে রক্ষণশীল হিন্দু ভোট বিজেপি-র ঘরে চলে যেত। কংগ্রেস-কে তাই হয়তো বাধ্য হয়েই সনাতন ধর্মের রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। শশী থারুর নিজে কতখানি শবরীমালার ইস্যুতে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষণশীল, তাই নিয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে এবং অন্যান্যদের এই অবস্থান নিতে হয়েছে ভোটের স্বার্থে। সংসদীয় গণতন্ত্র বড়ো বালাই!

কেরলের অর্থমন্ত্রী টমাস আইজ্যাকও স্বীকার করে নিয়েছেন যে শবরীমালা প্রশ্নে তাঁদের পার্টির ভোটারদের মধ্যে হিন্দু রক্ষণশীল অংশে ভাঙন ধরেছে। সেই অংশটি চলে গেছে কংগ্রেসের দিকে। বিজেপি যে এই আন্দোলনের সুফল পেল না, বরং কংগ্রেস পেল, তার একটা কারণ হতে পারে যে কংগ্রেস বামবিরোধী অবস্থান নিলেও শবরীমালাকে একটি আইন-শৃঙ্খলার ইস্যু বানিয়ে তোলেনি, যেটা বিজেপি তুলেছিল। কট্টর হিন্দু মৌলবাদী অবস্থান থেকেই বিজেপি ঘৃণার বাতাবরণ ছড়িয়েছে, আইন ভেঙে সশস্ত্র বিক্ষোভ দেখিয়েছে, এমনকী হিংসার আশ্রয়ও নিয়েছিল। কারণ বিজেপি-র লক্ষ্য ছিল তিরুবনন্তপুরমের ৬৭ শতাংশ হিন্দু ভোট, যেটা সমগ্র কেরলের যা গড় হিন্দু ভোট, ৫৫ শতাংশ, তার থেকে বেশি। কিন্তু সম্ভবত বিজেপি যেটা খেয়ালে রাখেনি, তা হল কেরলে মানচিত্রে গোবলয়ের হিংসা চলে না। জনগণ তাতে মুখ ফিরিয়ে নেন। দ্বিতীয়ত, শবরীমালা প্রশ্নে বিজেপি যতই মৌলবাদী অবস্থান নিয়েছে, ঠিক ততই তিরুবনন্তপুরমের ৩৩ শতাংশ ক্যাথলিক, মুসলিম ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত নাদার গোষ্ঠী থারুরকে বেছে নিয়েছে। অন্যান্য আসনগুলিতেও একই চিত্র। আবার উলটোদিকে শবরীমালা প্রশ্নে বামেদের উপর ক্ষুব্ধ কিছু ট্র্যাডিশনাল বাম ভোটও কংগ্রেসের ঝুলিতে গেছে। মনে রাখতে হবে, এই রক্ষণশীল হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান নিলেও গোবলয়ের হিংসার প্রকৃতি অনুমোদন করে না। দ্বিতীয়ত, কেরলে বহুকাল ধরে বিশাল সংখ্যক মুসলিম এবং ক্রিশ্চান গোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি থাকার ফলে এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাতাবরণ অনেকটাই কম। বিজেপি যেটা

ভুলে গিয়েছিল, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা আর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ সবসময়ে এক নয়। অমিত শাহ এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জানিয়েছিলেন, কেরালার সরকার এই বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাঁরা সরকার ফেলে দেবেন। অর্থাৎ, বিজয়ন সরকার যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করতে তৎপর হন, তাহলে কেন্দ্রের শাসক দল সেই অপরাধে তাঁদের শাস্তি দেবেন। স্বভাবতই, নাম্বুদিরিপাদ সরকার ফেলে দেবার স্মৃতি যাঁদের এখনও দগদগে, সেই কেরালাবাসী শত্রু চিনে নিতে ভুল করেননি।

এটা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক যে একটি মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের প্রসঙ্গটি অন্যান্য অর্থনৈতিক ইস্যু, বাম সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানকে পেছনে ফেলে দিল। এটাও মনে রাখতে হবে যে কেরলের সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন সরকার সেখানে কোনো বিপ্লব করেনি। এমনকী সামাজিক সংস্কারের কাজটিও সক্রিয়তার সঙ্গে তারা শুরু করেনি। তারা যেটা করেছে, তা শুধু এবং শুধুমাত্রই দেশের সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, যেটা একটি নির্বাচিত সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। সেই আনুগত্য থেকেই সুপ্রিম কোর্টের রায় লাগু করবার জন্য তারা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। সেই ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও বিজেপি করতে দিতে রাজি হয়নি। তার জন্য বিজয়ন সরকার যদি জনপ্রিয়তাও হারায়, তাহলেও এটা বলতে হবে যে মৌলিক আদর্শের প্রশ্নে তারা দায়বদ্ধ থেকেছে। শুধুমাত্র এই কারণেই, নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরেও কেরলে বামেদের উপর আস্থা রাখা সম্ভব, কারণ তাঁরা ভোটের ওপরে আদর্শকে স্থান দিয়েছেন। বামপন্থীরা ভোটে হারলেও থেকে যায়। কংগ্রেস বা বিজেপি থাকে না। সেই ভয়েই সম্ভবত কংগ্রেস এরকম নরম হিন্দুত্বের তাস খেলল। কংগ্রেস যদি সত্যি সত্যি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে চাইত তাহলে তাদের অনতিবিলম্বে আদালতের রায় কার্যকর হওয়ার পক্ষ নিতে হত। কিন্তু তাতে তাদের ভোট ক্ষতিগ্রস্ত হত। তাই আদর্শের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হল কংগ্রেস। এর ফলে ভবিষ্যতে হয়তো বিজেপি-র মাটি শক্ত হবে, সেটা জেনেও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থকে আগে রাখল। কেরলের বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন, কারণ কখনো কখনো পরাজয় এতই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে সেটা সাময়িক জয়ীদের ম্লান করে দেয়। কেরলে বামেরা যদি একটা ভোটও না পেত, তাহলেও তারা ইতিহাসের পাতায়, জনমানসের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত। যে সম্মানটুকুতে ভাগ বসাতে আপাতত কংগ্রেস বা বিজেপি অক্ষম।

‘এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না’

লোকসভা নির্বাচন শেষ, ফল প্রকাশিত। মিডিয়া তথা জনগণের উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত। আসুন কিছু অপ্রিয় কথা বলা যাক। ধরুন আপনাকে একদিন কোনো অজ্ঞাত কারণে পুলিশ বা মিলিটারি তাদের হেফাজতে নিল। আপনার পরিবার জানে না আপনি কোথায়, কেনই-বা আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্ধকার কুঠুরিতে বসে আপনি যখন আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিচ্ছেন ঠিক তখন আপনাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ‘টর্চার চেম্বার’-এ। শুরু হল অকথ্য অত্যাচার। আপনাকে ঝুলিয়ে রেখে বেদম পেটানো হল, বা আপনার পায়ে চিনি জল মাখিয়ে আপনার প্যান্টের ভিতর ক্ষুধার্ত ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হল, বিদ্যুৎ শক ও সিগারেটের ছেঁকা দেওয়া হল আপনার সর্বাঙ্গে। কোনো সৃজনশীল পুলিশ আধিকারিক হয়তো যৌনাঙ্গে বিদ্যুতের শক দিল, বা তার শক্ত রুল গুঁজে দেওয়া হল গুহ্যদ্বারে। আরো সৃজনশীল যারা তারা হয়তো নিতম্বের থেকে মাংস কেটে নিল! গা গুলিয়ে উঠছে? ভাবছেন কাফকা-র উপন্যাসের থেকেও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করছে *আরেক রকম*-এর কলাম! কিন্তু আশ্বস্ত থাকুন এর কোনোটাই স্বপ্ন নয়, ঘোর বাস্তব। কাশ্মীরে বিগত ৩০ বছর ধরে সেখানকার বহু মানুষের উপরে বিনা বিচারে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এই অত্যাচার সংঘটিত করেছে। এবং এই অত্যাচার করা হয়েছে আপনার মতন ভারতীয় নাগরিকের নামে, কারণ ভারতের নাগরিক মাত্রেই চায় যে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে থাকুক। সেই থাকাটা অবশ্যম্ভাবী করে তোলার জন্যই এই বিপুল আয়োজন। এবারে আপনাকে ঠিক করতে হবে যে আপনার নামে চলতে থাকা এই অত্যাচারকে আপনি মান্যতা দেবেন কি না!

কাশ্মীরের নাগরিক সমাজ এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অভিভাবকদের সংগঠন যৌথভাবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যাকে মান্যতা দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক শীর্ষ অধিকর্তা। রিপোর্টটি ইন্টারনেট থেকে যে-কেউ ডাউনলোড করতে পারেন। ৫৫০ পাতার রিপোর্টে নথিবদ্ধ করা হয়েছে ৪৩২ জন কাশ্মীরি ব্যক্তির উপর মর্মান্তিক রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের কাহিনি। অনেকেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা গেছেন, যাঁরা জবানবন্দি দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই সেই অত্যাচারের ক্ষত নিয়ে ভয়াবহ শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা

নিয়ে বেঁচে আছেন। এর মধ্যে দুই-একটি অত্যাচার এতটাই নির্মম এবং ভয়াবহ যে হলিউড বা বলিউডের ফিল্ম নির্মাতারাও হয়তো এহেন অমানবিকতা তাঁদের ছবিতে দেখাতে দ্বিধা করবেন।

যেমন ধরুন মেষপালক কালান্দার খাতানার মর্মন্তুদ ও করুণ কাহিনি। খাতানাকে ১৯৯২ সালে বিএসএফ গ্রেপ্তার করে উগ্রপন্থীদের গাইড হিসেবে কাজ করার অভিযোগে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর উপরে চলে ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় অত্যাচার। কখনো তাঁর নিতম্বের মাংস কেটে নেওয়া হয়। আবার কখনো তাঁর পা ভেঙে দেওয়া হয় কিন্তু চিকিৎসা করানো হয় না। অতএব, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই তাঁর পায়ে পোকা ধরে এবং অবশেষে তাঁর পা কেটে বাদ দিতে হয়। খাতানার স্ত্রীর উপরেও অত্যাচার চালানো হয়। বুকে লাথি মেরে তাঁর পাঁজর ভাঙা হয়। সেই ভাঙা পাঁজরে কাবু হয়ে কয়েক বছর পরে তিনি মারা যান। ৪৩২টি জবানবন্দির মধ্যে রয়েছে নগ্ন করে পেটানোর কথা, রয়েছে যৌন অত্যাচার, জলে লাল লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে সেই জল চোখে ঢালার মতো ঘটনা, রয়েছে নখ উপড়ে নেওয়া বা দাড়ি টেনে ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনা, উলটো করে ঝুলিয়ে রাখার মতন বিবিধ মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ।

কাশ্মীরের জনগণের উপরে যে অত্যাচার হয় তা প্রথম বার প্রকাশিত হল এমন নয়। বশরত পিরের অসাধারণ বই 'কারফিউড নাইটস'-এর পাতায় পাতায় এরকম অসংখ্য ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কিন্তু এই রিপোর্টটি পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে কারণ এর নেপথ্যে রয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং সরাসরি যারা এই অত্যাচারের শিকার তাদের সংগঠন।

কিন্তু আমরা বর্তমানে এমন এক ভারতবর্ষে বাস করি যেখানে সহনাগরিকদের উপরে এহেন অত্যাচার আর আমাদের মনে কোনো দাগ কাটে না। বিশেষ করে তারা যদি কাশ্মীরি হয় তাহলে তো আমরা রাষ্ট্রের সমস্ত নির্মম অত্যাচারকে চোখ বুজে মান্যতা দিয়ে ফেলি। তাই এহেন একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও, আমাদের মিডিয়াতে তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। কোনো টিভি চ্যানেল এই প্রতিবেদন নিয়ে এক মিনিট সময় নষ্ট করেছে এহেন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। তবু, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ!

এমনই অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীর যে সেখানে ভারতের সংবিধানে মানুষকে সম্মান ও সম্ভ্রমসহ বেঁচে থাকার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে আদতে সাধারণ মানুষের জন্য তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কাশ্মীরের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি মানুষের রয়েছে একরাশ ঘৃণা। এবারের নির্বাচনে কাশ্মীর উপত্যকায় ভোট দেওয়ার হার বিগত দুই দশকে সর্বনিম্ন। আবার জম্মুকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বিজেপি হিন্দুত্বের গড়ে পরিণত করেছে। তাই জম্মু ও কাশ্মীর একই রাজ্য হলেও তাদের হৃদয় ভিন্ন হয়ে গেছে। কাশ্মীরের জনগণের সামনে আমরা ভারত রাষ্ট্রের যে চরিত্র হাজির করেছি তারপরে এই দাবি করা যে কাশ্মীরের জনগণ ভারতের তেরঙ্গাকে নিত্য পুজো করবে, তা অত্যন্ত অসংবেদনশীল এবং ভ্রান্ত। কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে আমরা দাবি করতেই পারি। কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ তা যদি মনে না করে তবে আমাদের কাশ্মীরের শরীর নিয়েই থাকতে হবে, তার আত্মা কোনোদিন আমাদের সঙ্গে একাত্ম হবে না।

একাত্ম করার চেষ্টা ভারত রাষ্ট্রকেই করতে হবে। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা মনে করে কাশ্মীরি মানেই দেশদ্রোহী এবং তাদের পেটানোই দেশপ্রেম। এরাই যখন আবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে তখন বলাই যায় যে, কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া সমস্ত অত্যাচার আবারও ঘটবে। আমরা শুধু আশা করতে পারি যে, ভারতের বাকি অংশের নাগরিক সমাজ শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধারণ কাশ্মীরিদের পাশে দাঁড়াবে। তা যদি আমরা না করতে পারি তবে কাশ্মীর ভারতের হলেও, ভারত কোনোদিন কাশ্মীরিদের দেশ বলে গ্রাহ্য হবে না।

ইরান নিয়ে সাজ সাজ রব

শেষ পর্যন্ত তিনি নাকি যুদ্ধ নয়, ইরানের সঙ্গে শান্তিই চান। কিন্তু তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প, একে বড়লোকের আহ্লাদী ছেলে, তায় আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, অতএব শান্তির বার্তাও তিনি দেন ধমকে, চমকে, চাবুক মেরে। পাছে কেউ ভেবে বসে আমেরিকা আর বিশ্বের সর্বশক্তিমান দেশ নয়, বা ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বের সর্বশক্তিমান পুরুষ নন। বাজারে আজকাল ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির ছড়াছড়ি। এই পুতিন ইউক্রেনকে কবজা করছেন, ওই নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে সবক শেখাচ্ছেন, এই নেতান্যাহু প্যালেস্টাইনকে গিলে ফেলছেন, ওরে বাবা থমথম কে হইতে কে কম। এমতাবস্থায় ট্রাম্পই-বা কী করে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। বিশেষ করে সামনে পুনর্নির্বাচনী লড়াই, আগামী মাস থেকেই শুরু করবেন তাঁর প্রচার।

যদিও, ইরানের সঙ্গে নতুন করে সমঝোতার প্রয়োজন

আদৌ ছিল না। বহু সাধ্যসাধনার পর, ট্রাম্পের পূর্বসূরি বারাক ওবামার পৌরোহিত্যে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরানের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সই হয়েছিল মাত্র চার বছর আগে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বভাবই খুঁচিয়ে সমস্যা তৈরি করা ও ঢাকঢোল পিটিয়ে তার সমাধানের তোড়জোড় করা। তার ওপর, ওবামা জমানার কোনো কিছুই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। অতএব, বেশ কিছুদিন হম্বিতম্বি করে গত বছর চুক্তিটা খারিজই করে দেন ট্রাম্প সাহেব। যদিও চুক্তির অন্য স্বাক্ষরকারীরা, যেমন ফ্রান্স, চিন, ইত্যাদি, এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা পরিষ্কার বলেছিল যে ইরান কোনোভাবেই চুক্তি লঙ্ঘন করেনি তাই চুক্তি খারিজ করার কোনো ভিত্তিই ছিল না।

ট্রাম্প এইসব ন্যায়নীতির ধার ধারেননি। আর পাঁচ জন সাধারণ মার্কিন নাগরিকের মতো তিনিও মনে করেন ইরান দুষ্ট দেশ, কারণ তারা সেই ১৯৭৯ সাল থেকে আমেরিকার দাদাগিরিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এসেছে, কুর্নিশ তো করেইনি বরং সমানে সমানে কথা বলার সাহস দেখিয়েছে। তার ওপর, ট্রাম্পের দুই মিত্র দেশ, ইজরাইল ও সৌদি আরব, যাদের হাতে তিনি মধ্য প্রাচ্যটা মোটামুটি সঁপে দিয়েছেন, তাদেরও দু-চক্ষুর বিষ এই ইরান। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতান্যাহু তো প্রকাশ্যেই বলে বেড়ান, ট্রাম্পকে ইরান চুক্তি বাতিল করতে রাজি করিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু বিদেশনীতিতে দেখানোর মতো কোনো কৃতিত্ব নেই ট্রাম্পের কাছে। বরং ব্রিটেনে তিনি প্রায় ব্রাত্য, নেটোর সদস্যরা তাঁর ওপর অপ্রসন্ন, প্রতিবেশী কানাডা বিরূপ। অগত্যা ইরান। পুরোনো শত্রুর সঙ্গে নতুন চুক্তির কথা উত্থাপন করলেন ট্রাম্প নিজেই। বলাই বাহুল্য, সোজাসুজি নয়। ব্যবসায়ী জগতে নাকি দাঁও মারতে হয় এইভাবেই, আর ট্রাম্প তো আগে ব্যবসায়ী তারপর রাজনীতিক, তা তিনি হোয়াইট হাউসেই থাকুন বা ট্রাম্প টাওয়ারে।

খাতা খোলা হয় ইরানের বিরুদ্ধে শান্তি লঙ্ঘনের খান কতক অভিযোগ দিয়ে। সর্বৈব মিথ্যা, বলে ইরান। ট্রাম্প সে-কথা নস্যাৎ করে পারস্য দেশের 'আনুষ্ঠানিক ইতি' ঘটানোর মতো চমকপ্রদ সব হুমকি দিতে থাকেন। একইসঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ রওনা হয়ে যায় পারস্য উপসাগরের পথে, শোনা যায় পশ্চিম এশিয়ায় যাচ্ছে বিশাল এক মার্কিন বাহিনী, আংশিক খালি করা হয় বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস, মার্কিন তেল কোম্পানি এক্সন মোবিল ইরাক থেকে বিদেশি কর্মচারীদের সরিয়ে নেয়। যাকে বলে সাজ সাজ রব।

তারই মাঝে আলোচনার প্রস্তাবও দিতে থাকেন ডোনাল্ডবাবু, তবে ঘুরিয়ে। ইরান ফোন করে বৈঠকের অনুরোধ করুক, অবশ্যই আলোচনায় বসবেন তিনি। কোন নম্বরে ফোন করতে হবে তাও জানিয়ে দেন তিনি। সেই ফোন বাজেনি আজও। ইরানের বক্তব্য, ট্রাম্প তাদের সম্মান করে কথা বলুক, না-হলে এই পরিস্থিতিতে আলোচনা অর্থহীন। প্রাচীন পারস্য সভ্যতার ধারক-বাহকদের পক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অমার্জিত ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়া শক্ত।

ঠেকেও শেখেননি ট্রাম্প। একইভাবে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সমঝোতার সূচনা করেছিলেন তিনি। গোড়ায় গরমাগরম বুলি, এই বুঝি যুদ্ধ লাগে লাগে। তারপর, সিঙ্গাপুরে মহা ধুমধামে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। বলতে কী, আন্তর্জাতিক আঙিনায় উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির অভিষেকই হল তাঁর তত্ত্বাবধানে। দিকে দিকে বার্তা রটে যায় ট্রাম্প তাঁকে যেখানে সই করতে বলবেন সেখানেই সই করবেন কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ কিম। শান্তির নোবেলের স্বপ্নও দেখে ফেললেন তাঁরা। হায়, দু-দেশের সম্পর্ক যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই। উলটে কিম আজ চিন কাল রাশিয়া ঘুরে বেড়িয়ে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছেন। ইরান সমস্যা যে উত্তর কোরিয়ার তুলনায় কত গুণ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য ট্রাম্প সত্যি যুদ্ধ চান কি? যুদ্ধবাজ হিসেবে খ্যাতি তাঁর নেই, বরং ইরাক যুদ্ধের তীব্র নিন্দাই করেছেন তিনি, আফগানিস্তান থেকে মার্কিনি সেনা সরিয়ে নিতে উঠে-পড়ে লেগেছেনও। তাঁর দেশবাসীরা যে আবার এক যুদ্ধে যেতে চাইবে না তাও তাঁর জানা। বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাচ্ছে না বিরোধী ডেমোক্র্যাট দল ও ইউরোপের দেশগুলিও। বিশেষ করে যখন ইরানের অপকর্মের তেমন কোনো জোরদার সাক্ষ্যপ্রমাণ এখনও দাখিল করা যায়নি। সাদ্দাম হুসেনের পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারের জুজু দেখিয়ে ইরাক যুদ্ধ শুরুর কথা ভোলেনি কেউই। ভয় দেখিয়ে ইরানকে দিয়ে কঠিন কঠিন শর্তে সই করিয়ে নেওয়াই যে তাঁর উদ্দেশ্য সেটা বোঝা যায়।

তবু সারা বিশ্ব ভয়ে কাঁটা। কে জানে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, হাঁকডাক করতে করতে অতর্কিতে আরেকটা যুদ্ধ না বেধে যায়। ট্রাম্পকে ভরসা নেই। তাঁকে উসকানি দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই। ক-দিন আগে ট্রাম্প নিজেই বলেছেন, আমেরিকার 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' এখনও প্রবল পরাক্রমে বিরাজ করছে এবং তারা সত্যিই যুদ্ধ ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের মতো ইরানের শক্তির উৎসও বিশাল খনিজ তেলের সম্ভার আর তেলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যায় মার্কিন প্রশাসন মাত্রেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জমানা, রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ছকা হচ্ছে খনিজ তেলকে ঘিরে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেগ কিনা ইরানের তেল শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেললেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

চুপ করে হজম করে কী করে। তারা যে অপর্যাপ্ত তেল চায় তাই নয়। চাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও, চাই মার্কিন তেল কোম্পানির জন্য পৃথিবীর সর্বত্র অবারিত দ্বারও। স্বভাবতই, মোসাদ্দেগকে বাড়তে দেওয়া হয়নি। ১৯৫৩ নাগাদ সিআইএ-র মদতে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোসাদ্দেগকে হটানো হল, সংসদীয় রাজনীতি খারিজ করে পহলভি রাজবংশের মহম্মদ রেজা শাহকে তেহরানের মসনদে বসানো হল এবং অচিরেই তেল কোম্পানির বেসরকারিকরণ, কার্যত মার্কিনিকরণ, সম্পন্ন হল। উপরন্তু, ডঙ্কা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল মার্কিন কূটনীতির নবতম মূলমন্ত্র: অনুন্নত দেশ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্পন্ন অনুন্নত দেশ, জাতীয়তাবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছ তো মরেছ।

ইরানে হল ঠিক উলটো। শাহের দৌরাত্ম্যে জাতীয়তাবাদ ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে অগ্ন্যুৎপাতের মতো ছড়িয়ে পড়ে ১৯৭৯ সালে। পত্রপাঠ বিতাড়িত হন শাহ রেজা, ক্ষমতায় আসে গোঁড়া ধর্মীয় যাজকরা এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিদায় দেওয়া হয় মার্কিনিদের। সেই থেকে আমেরিকার বিষনজরে পড়ে আছে ইরান। শোধ তুলেছে খেপে খেপে কঠোর থেকে কঠোরতর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আসল যুদ্ধের বোমাবর্ষণের থেকে কম পীড়াদায়ক নয় নিষেধাজ্ঞার নির্মম ফাঁস। এই নিদারুণ নিপীড়ন থেকেই মুক্তির আশা দেখিয়েছিল ওবামার চুক্তি কিন্তু ট্রাম্পের কাছে সে মনুষ্যত্ববোধ আশা করাও বোকামি।

বরং তাঁর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে সাধারণ ইরানবাসীর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে শুনে স্পষ্টতই উল্লসিত তিনি। কতদিন আর এভাবে চলতে পারবে ইরান? জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য। অনেক কিছু পাওয়াই যায় না। খাদ্যদ্রব্যে টান পড়েছে, ঔষধাদি ও চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রায় দুষ্প্রাপ্য। মার্কিন ইতিহাসেও এত কঠোর নিষেধাজ্ঞার জুড়ি পাওয়া ভার। ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা আবার সর্বব্যাপীও। ইরানের সঙ্গে লেনদেন করলে আমেরিকার রোষ থেকে পার পাবে না কেউ। অত বড়ো বুকের পাটা বেশি দেশের নেই। ভারতের তো নয়ই।

ভারতের তেলের একটা বড়ো অংশ আসে ইরান থেকে। ট্রাম্পের চাপে সপ্তাহ দুয়েক আগে সেই আমদানি বন্ধ করে দিতে হয়েছে। যদিও এযাবৎ ভারত শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জের জারি করা নিষেধাজ্ঞাই মান্য করে এসেছে, আর কারও নয়। ইরানের তেলের অন্য দুই প্রধান খদ্দের, চিন ও তুরস্ক, কিন্তু আমেরিকার চাপের কাছে এখনও নতি স্বীকার করেনি। ভারত তড়িঘড়ি এগিয়ে গেছে, তেলের দাম বেড়ে যেতে পারে জেনেও।

ইরান ঘোর বিপাকে। এত বড়ো একটা আয়ের পথ ফের চালু করতে নির্বাচনের মধ্যেই দিল্লি ঘুরে গেলেন বিদেশমন্ত্রী জাভদ জরিফ। সুষমা স্বরাজ তাঁকে মিষ্টি করে বলে দেন, বিদায়ী সরকারের পক্ষে এই গুরু সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়, অপেক্ষা করতে হবে নতুন সরকারের জন্য। নির্বাচনী ফলাফলের পর তেহরানের বোধহয় জানার কিছু বাকি নেই। নরেন্দ্র মোদী লৌহপুরুষদের দলে নাম লেখাবেন সেটাই স্বাভাবিক। ট্রাম্প, নেতান্যাহুকে ছেড়ে তিনি যে আয়াতোল্লাদের জড়িয়ে ধরবেন না সে কথা হলফ করে বলা যায়। কোমর বাঁধুন, তেলের দাম বাড়বে লাফিয়ে লাফিয়ে, প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে, বিরোধীরা কামড়াকামড়ি করবে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে, প্রাণ যাবে উলুখাগড়াদের।

ভাঙারে জোড়া দেবে সে?

অর্ধেন্দু সেন

কে ভাঙল বিদ্যাসাগরের মূর্তি? তৃণমূল না বিজেপি? ভালো সমাজবিরোধী না খারাপ সমাজবিরোধী? সিসিটিভি ছিল, সবই ছিল কিন্তু যথারীতি সেগুলো কাজ করেনি। রেগুলেটেড মার্কেট যেন আছে কিন্তু কাজ করে না। সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল যেমন থাকে কিন্তু কাজ হয় না। তেমনই আর কি। অবশ্য অন্য ক্যামেরায় দেখা গেছে গেরুয়া রঙের জামা পরা কিছু দুষ্কৃতী মূর্তি ভাঙায় ব্যস্ত। সে ছবি প্রকাশ করেছে তৃণমূল কাজেই ধরে নেওয়া যায় ছেলেগুলো ভক্তের দলের। ছবি দেখামাত্র বিজেপি-র কেউ বিধান দেয়নি যে ছবি ভেজাল। ও ছবি হায়দ্রাবাদ বা চণ্ডীগড়ে পাঠাবার দরকার নেই। অমিত শাহই দোষী। কিউ.ই.ডি.।

অতই সহজ? বিজেপি প্রাণপণ চেষ্টায় আছে বাংলায় সিটের সংখ্যা বাড়াতে। দল চাইছে ২২টা। কেউ দিচ্ছে দশ কেউ ছয়। অমিত শাহ রাজ্যে আসছেন সোম বুধ শুক্র। মোদী আসছেন মঙ্গল বৃহস্পতি। লড়াই হচ্ছে ইঞ্চিতে। এইসময় কেউ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিমুখ করে? কাণ্ডজ্ঞান নেই? নিশ্চয়ই তৃণমূল করিয়েছে কাজটা বিজেপি-কে বদনাম করতে। উপরতলার লোকেরা যদি চেয়েও থাকে ভাঙতে বহিরাগত চ্যাংড়াগুলো চিনল কি করে দয়ার সাগরকে? রোড শোয়ের মেন রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকে গেট টপকে ছাত্র সংসদের চোখে ধুলো দিয়ে নিখুঁতভাবে বার করে আনল মূর্তি? ভিতরে না ভেঙে বাইরে এনে ভাঙার কী দরকার ছিল?

এ প্রশ্ন অনেকের মনেই এমনকী ফেলুদারও। আমার মতো অবসরপ্রাপ্তেরা না-হয় অনন্তকাল কাটিয়ে দিতে পারেন প্রশ্নের মীমাংসায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন? তাদের সময় লাগে কেন? পুলিশ প্রশাসন তাদের হাতে। কলকাতায় প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয় না। ঘণ্টা তিনেকের অনুসন্ধানেই পরিষ্কার হয়ে যেত কখন কীভাবে কী হয়েছিল। যে পক্ষের দোষ তাকেই শাস্তি দেওয়া যেত। ব্রিটিশ সরকার যেমন চুরি বন্ধ না করতে পারলে গোটা গ্রামকেই ফাইন দিতে বাধ্য করত সেইভাবে প্রচারের সময় কমিয়ে সব প্রার্থীকে শাস্তি দেবার তো দরকার ছিল না। তাহলে কী কমিশন বুঝেছিল বিজেপি-র দোষ? এগোবার সাহস হয়নি? তৃণমূলের দোষ যদি প্রমাণিত হত তাহলে তৃণমূলকে অপদস্ত করার সুযোগ কমিশন ছাড়তে পারত না।

কথাটা বলতে হল এই কারণে যে এবারের দীর্ঘ নির্বাচনে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বারে বারেই প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রথম কমিশন নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের জন্য প্রার্থীদের শাস্তি দিয়েছে। মেনকা গান্ধীকে প্রচারে বলতে শোনা গেছে যদি কোনো মুলসমান ভোটার তাকে ভোট না দেয় সে যেন তার কাছে না আসে কোনো কাজের জন্য। যোগী আদিত্যনাথ ভারতের সেনাবাহিনীকে মোদীর সেনা বলেছেন। দুজনকেই কমিশন তিন দিনের জন্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বেলায় কিন্তু কমিশন সে সাহস দেখাতে পারেনি।

মোদী সুযোগ নিয়েছেন এই দুর্বলতার। সেনাবাহিনীর নামে ভোট চাওয়া যায় না। এ শুধু নির্বাচনের ব্যাপার নয়। দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন। দেশের প্রাক্তন নৌসেনা প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। মোদীকে থামানো যায়নি। মোদীর মিটিং-এ একাধিকবার দেখা গেছে পুলওয়ামার নিহত জওয়ানদের ছবি। তিনি দেশের তরুণ ভোটারদের বলেছেন তাদের প্রথম ভোট এই জওয়ানদের নামে উৎসর্গ করতে। উৎসর্গ না-হয় হল। ভোটটা দেবে কাকে? যাদের গাফিলতিতে অতগুলো প্রাণ গেল? তাদেরই? বেশ তো!

সেনাবাহিনীর সাফল্যকে নিজের সাফল্য বলে চালাতে মোদীর কোনো অসুবিধা হয়নি। বালাকোট অভিযানের দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে এয়ার ফোর্স চিন্তামগ্ন ছিল। মোদী তাদের অভয় দেন। বলেন মেঘের আড়াল থেকে তির নিক্ষেপ করতে। এয়ার ফোর্স কোথায় গিয়ে বোমা ফেলে এসেছে প্রশ্ন করলে তাদের অপমান হয় কিন্তু মোদীর মতো আবোল-তাবোল বকলে অপমান হয় না। দেশভক্তদের এই বিচারের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কমিশন একমত। মেনকার তুলনায় পিছিয়ে থাকার লোক নন মোদী। তিনি বললেন হিন্দুপ্রধান নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে

দাঁড়াবার সাহস নেই বলে রাহুল কেরালার ওয়ানাড থেকে লড়ছেন। এ কেমন দেশ আমাদের যে এরকম কথা বলে বাড়তি ভোটের আশা করা যায়? সে যাই হোক, কমিশন কিন্তু মোদীর কথায় আপত্তিকর কিছু পায়নি। একসময় মনে হচ্ছিল 'আমি মুসলমান বিদ্বেষী। আমি জয়ী হলে মুসলমানের ভোটাধিকার কেড়ে নেব।' —এই কথা লিখে তিন কপি কমিশনে জমা না দিলে কমিশন কিছুই করবে না। এখন অবশ্য জানা গেছে অন্তত একজন কমিশনার মোদীকে ছাড় দিতে চাননি।

বহু বলে বলীয়ান কমিশনের এই অসহায় আচরণ মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। জোর সমালোচনা করেছেন অনেকেই। আমরা একশো জনের বেশি অবসরপ্রাপ্ত অফিসার খোলা চিঠি লিখে কমিশনের নিন্দা করেছি। বাংলার মানুষ আগে দেখেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন কীভাবে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা অতিক্রম করে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছে। গতবছর আমরা দেখেছি তার উলটোটা। মেরুদণ্ডহীন অযোগ্য অপদার্থ কমিশনার তার গাড়ি বাড়ি টেলিফোন ঠিক রাখতে নিজের চূড়ান্ত অপমান মেনে নিল। একটাই সান্ত্বনা ছিল তখন। দিল্লির নির্বাচন কমিশন অনেক বেশি ক্ষমতাবান। তাদের এভাবে বেইজ্জত করা যায় না। সেটুকু সান্ত্বনাও আর রইল না।

দিল্লির কমিশনের একটা সুবিধা ইচ্ছামতো কেন্দ্রীয় পুলিশ জোগাড় করতে পারে। একটা সময় ছিল যখন সিআরপি রাজ্যে এসে বসে থাকত। তাদের কাজে লাগানো হত না। এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে এমন নয় যে রাজ্য পুলিশের সহযোগিতা ছাড়াই কমিশন কাজ তুলে নিতে পারে। সিআরপি বুথ সামলাতে পারে। বাইরে গোলমাল হলে রাজ্য পুলিশই ভরসা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে পুলিশকে শাসিয়েছেন যে কমিশনের কথামতো কাজ করলে পরে শাস্তি পেতে হবে। ২০১৬ সালে তিনি একই কথা বলেছিলেন এবং করে দেখিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁর কথা নিশ্চয়ই হেলাফেলা করবে না।

কমিশনের উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশ দেওয়া। ও কথা না বলতে অনুরোধ করা। অনুরোধে কাজ না হলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা। তাতেও কি কাজ হত? সবটা না হলেও কিছুটা তো হত। চেষ্টা করতে আপত্তি কেন? কমিশন হয়তো ভাবল প্রধানমন্ত্রী যা খুশি করছেন মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলা উচিত হবে কি? কমিশনের এক অফিসার বলে বসলেন বাংলার অবস্থা পনেরো বছর আগেকার বিহারের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোন যুক্তিতে কোনো অফিসার বলে একথা? কমিশন কেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিরস্কার করল না?

সেলাইটা ঠিক সময় না দিলে একটার বদলে ন-টা দিতে হয়। শেষমেষ যখন কমিশন পদক্ষেপ গ্রহণ করল তখন দেখা গেল মারমূর্তি। হোম সেক্রেটারিকে সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে চিঠি লেখার জন্য। সম্ভবত দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এই প্রথম বার সংবিধানের ৩২৪ ধারা প্রয়োগ করা হল। কী লিখেছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব? পরামর্শ দিয়েছিলেন গোলমাল ঠেকাবার জন্য যে কুইক রেসপন্স টিম আছে তাতে রাজ্য পুলিশ ব্যবহার করতে। এতে অসুবিধা কোথায়? কমিশন তো করেছেও তাই। তা ছাড়া উপায় নেই তো। বাইরের ফোর্স তো রাস্তা চেনে না। কোথায় যেতে হবে বুঝবে কী করে? ওলায় যাবে, না উবারে? একটা কথা বলা যায়, সংঘাতের পরিস্থিতি যেহেতু ছিল চিঠিটা হোম সেক্রেটারির লেখা উচিত হয়নি। যেহেতু তিনি পদমর্যাদায় সিইও-র উপরে তার পরামর্শ নির্দেশেরই মতো। তাই 'ইন্টারফিয়ারেন্স'-এর অভিযোগ আনা যেতেই পারে। চিঠিটা লেখা উচিত ছিল মুখ্যসচিবের। পাঠানো উচিত ছিল কমিশনে। আমার দুপুরগুলো কাটছিল নির্বাচনী প্রচার শুনে। তার মধ্যে মোদী আর মমতা ছিলেন বাধ্যতামূলক। কখনো দুজনই থাকতেন এক স্ক্রিনে। সঙ্গে গ্রাফিক্স। প্রচারের সময় কমিয়ে দেওয়ায় আমার মতো বহু লোক উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু তাও বলব কমিশন ঠিক কাজ করেনি।

ভোট গ্রহণের শেষ দিনের আগেই মোদীকে দেখা গেল কেদারনাথে। না। নির্বাচনী প্রচারে নয়। গিয়েছেন মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ ঠিকমতো হয়েছে কিনা দেখতে। যে মানুষ দিনে ২৩ ঘণ্টা কাজ করে তাকে তো বলা যায় না দুদিন পরে যেতে। তাও কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে মনে করিয়ে দিল যে নির্বাচনী বিধি কিন্তু লাগু রয়েছে। মোদী তাই গুহার ভিতরে ধ্যানমগ্ন হলেন। কমিশনের বলে দেওয়া উচিত ছিল এই সফর সংক্রান্ত কোনো ছবি রবিবার সন্ধ্যার আগে দেখানো যাবে না। সে নির্দেশ না থাকায় আমরা সারাদিনই দেখলাম তপস্যারত সেই সৌম্যকান্তি ঋষির (!) ছবি। বেনারসের ভোটার তো দেখলই।

বিদ্যাসাগরের মূর্তির টুকরোগুলো প্রধানমন্ত্রী যেভাবে জড়ো করলেন মনে হল নবান্নে নিয়ে গিয়ে দেখতে চান জোড়া লাগানো যায় কিনা। যে বিপন্নভাব যে বেদনার ছবি দেখলাম তাঁর মুখে তা ফুটিয়ে তুলতে টলিউডের তরুণীদের পাঁচটা টেক দিতে হত। কিন্তু কেন? বিদ্যাসাগর তো চেয়েছিলেন রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার হোক। তৃণমূল তো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বেছে নিয়েছে উত্তম দাওয়াই দেবার জন্য। শিক্ষার মতো নৈরাজ্য তো আর কোথাও চোখে পড়ে না। আর কোথাও তো শুনি না যারা পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের লিস্ট বেরোবে না। আর কোথাও তো দেখি না কন্যাশ্রীর পুরো টাকাটাই দিয়ে দিতে হয় অ্যাডমিশনের জন্য। মূর্তি যারা ভাঙল তাদের বাংলায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে কারা? 'সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে'— আগেই বলেছি এ মন্তর আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ মন্ত্রে বিদ্যাসাগরের মূর্তি জোড়া লাগবে না।

বাম বিপর্যয়

শুভনীল চৌধুরী

২০০৪ সাল। জ্যোতি বসু এবং হরকিষণ সিং সুরজিৎ তখন সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের শীর্ষ নেতা। কেন্দ্রে বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে পাঁচ বছর টানা লড়াই আন্দোলন করেছে বামফ্রন্ট। স্বচ্ছ ঘোষণা করেছে যে যেখানে বামফ্রন্ট শক্তিশালী সেখানে বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়া উচিত মানুষের। কিন্তু বাকি আসনে কংগ্রেস বা অন্য যেকোনো ধর্মনিরপেক্ষ দল যারা বিজেপি-কে হারাতে পারবে মানুষ যেন তাদের ভোট দেয়। আরো স্পষ্ট ঘোষণা, কেন্দ্রে যদি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ার জন্য বামপন্থীদের সমর্থনের প্রয়োজন হয়, তাঁরা তা নির্দ্বিধায় করবেন। মে মাসে যখন লোকসভা নির্বাচনের রায় বেরোল দেখা গেল যে বামেরা স্বাধীনতার পরে সর্বাধিক, ৬২টি আসনে বিজয়ী হয়েছে, বামপন্থীদের ব্যতিরেকে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়া সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যে বামেরা জিতেছিল ৩৫টি আসন এবং প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট। কেরল ও ত্রিপুরায় বামেদের ফল অনুরূপ।

মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে এহেন ফলাফলের থেকে বামফ্রন্টের মোট আসনকে এক সংখ্যায় নিয়ে আসার কৃতিত্ব দিতে হবে বর্তমান নেতৃত্বকে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে যে গোটা দেশে বামফ্রন্ট আসন জিতেছে মাত্র ৫টি। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ঝুলিতে একটি আসনও জোটেনি, কেরলে কোনোক্রমে তারা একটি আসন জিতেছে এবং ত্রিপুরাতে তারা তৃতীয় স্থানে চলে গেছে। বিশেষ করে আমরা এই নিবন্ধে পশিচমবঙ্গের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু এই কথা এখানে বলতেই হয় যে বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আজকের দিনে মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এঁরা যেই ভাষায় কথা বলেন জনগণ তা বোঝে না। এঁরা কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি, চেষ্টাও করেছেন বলে মনে হয় না। ভারতের ইতিহাসে বাম আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে, যেই ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে দেশে বাম আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাকে তছনছ করে দেওয়ার দায় সম্পূর্ণভাবেই বাম নেতৃত্বকে নিতে হবে। বামেদের সমর্থনে ধসের পরিমাণ বোঝাতে হলে একটি তথ্যই যথেষ্ট। ২০০৪ সালে দুই বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল দেশের মোট ভোটের ৭.০৭ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে কমে হয়েছে ২.৩৩ শতাংশ।

একথা অবশ্যই ঠিক যে ২০১৯ সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে দেশের একটি বৃহৎ অংশের মানুষ বিজেপি-র দ্বারা প্রভাবিত। উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্বের রাজনীতির প্রতি একটি বড়ো অংশের মানুষের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বামপন্থীরা। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে তাঁরা বলার মতন কোনো আন্দোলন করতে পারেননি। বরং কংগ্রেসের হাত ধরে কীভাবে রাজনৈতিক বৈতরণী পার করা যেতে পারে তা নিয়ে দিবারাত্রি ভেবেছেন, পার্টির সম্পাদক বদল করেছেন, ২০১৫ সালের পার্টি কংগ্রেসে পাস হওয়া রাজনৈতিক লাইনকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জোট করেছেন, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। গোটা বাম আন্দোলন তথা তার নির্বাচনী ভবিষ্যৎকে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, কংগ্রেসের সঙ্গে জুড়তে গিয়ে বাম তকমাটাই নেতারা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছেন। অধিক কংগ্রেস প্রেমের ফলে কেরলের জনগণ বাম নয় বিজেপি-র বিরুদ্ধে কংগ্রেসকেই বেছে নিয়েছে।

এই নির্বাচনের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে কংগ্রেসকে দেশবাসী কোনো বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। কংগ্রেস তথা বহু অন্য দলের পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষিপ্ত। তাই লালু-তেজস্বী, অজিত সিংহ পরিবার, মুলায়ম-অখিলেশ ইত্যাদি পরিবারতান্ত্রিক দল নির্বাচনে ভালো ফল করতে পারেনি। এর গভীর আর্থ-সামাজিক কারণ রয়েছে। ভারতের প্রবল আর্থিক তথা সামাজিক বৈষম্যের পরিণতি হিসেবে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে যে বড়োলোকের সন্তানের কোনো গুণ না থাকলেও সে জীবনে টাকা ও বংশপরিচয়ের জোরে উন্নতি করে। গরিবের সন্তান গরিব রয়ে যায়, শত গুণ থাকলেও। অর্থনীতিবিদরা তথ্যসহ এই প্রবণতা ভারতে যে কাজ করে তার

প্রমাণ রেখেছেন। এহেন একটি অসম সমাজে স্বাভাবিকভাবেই যারা শুধুমাত্র বংশগত পরিচয় বা টাকার জোরে নিজের জীবন গুছিয়ে নিচ্ছে তাদের প্রতি খেটে-খাওয়া মানুষের রাগ থাকবে। সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির বিরুদ্ধে যার শিরোমণি হল কংগ্রেস। মোদীর লাখো সমালোচনা করলেও মানতেই হবে যে সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসেও তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অসম সমাজের প্রবণতার বিরোধী হিসেবে মানুষ মোদীকে দেখেছে।

বামপন্থী নেতারা এইসব তত্ত্বের কচকচানিতে আর বিশ্বাস করেন না। তাঁরা এতটাই জনবিচ্ছিন্ন যে এই প্রবণতা তাঁরা বুঝেই উঠতে পারেননি। কংগ্রেসের মতন একটি পরিবারতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সদ্ভাব, পারলে তাদের কথামতোই পার্টির রাজনীতিকে পরিচালিত করার রাজনীতি মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। শ্রেণিসংগ্রামের মঞ্চ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে এসে শুধুমাত্র নির্বাচনী পাটিগণিতের মন্ত্রে দীক্ষিত বামেদের প্রতি মানুষের আর কোনো বিশ্বাস নেই। একথা শুনে অনেকেই হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন। বামেরা নাসিক থেকে মুম্বই পদযাত্রা করল, দিল্লিতে শ্রমিক সমাবেশ করল আর আমি কিনা বলছি যে শ্রেণিসংগ্রাম থেকে বামেরা সরে গিয়েছে? ঠিক, কয়েকটি সমাবেশ হয়েছে, যেগুলি আমাদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের যেই নাসিক জেলায় এত বড়ো কৃষক আন্দোলন হল সেই জেলার আসন দিন্দোরিতে সিপিআইএম-এর কৃষকসভার নেতা (জেপি গোভিট) ভোট পেয়েছেন ৯.৬ শতাংশ এবং রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। এর মানে এই নয় যে কৃষক আন্দোলন কোনো দাগ কাটতে পারেনি। এর মানে এই যে যেই দাগ কৃষক আন্দোলন বাম মননে রাখতে পেরেছে তা সাধারণ মানুষের জনসমর্থন হাসিল করার জন্য যথেষ্ট নয়। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের অক্লান্ত লড়াই কেন ১০ শতাংশ মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারল না, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে ভাবতে হবে। তবে মহারাষ্ট্রের নির্বাচনী ফলাফলের থেকে বামেদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ। তাই তাকানো যাক পশ্চিমবঙ্গের দিকে।

পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়

১৯৫২ সালে, স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ৯.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং আরএসপি ২.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দুটি আসনে জয়ী হয়েছিল। অর্থাৎ তখন মোট ২৬টি আসনের মধ্যে বামেরা পেয়েছিল ৭টি আসন এবং ১১.৯ শতাংশ ভোট। সদ্য স্বাধীন দেশ, অনেক সমস্যা, বাম আন্দোলন বলে কিছু তখনও তেমনভাবে দানা বাঁধেনি, সরকারে যাওয়া তো তখন অলীক কল্পনার মতন। সেই সময়ে বামেরা ২৬টির মধ্যে ৭টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন।

বর্তমান বাম নেতৃত্বের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের বাম আন্দোলনের ঘড়ির কাঁটা ১৯৫২ থেকেও পিছিয়ে গেল। ২০১৯ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি আসনে (বহরমপুরে আরএসপি প্রার্থী ধরে) বামেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। একটি বাদে প্রত্যেকটি আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের বাম আন্দোলনের যে অপূরণীয় ক্ষতি করে দিল তার জন্য ইতিহাস কখনো তাদের ক্ষমা করবে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এমন হয়েছে যে বামেরা নিজেদের জামানত বাঁচাতে পারছে না। ১৫ বছর আগে যারা ৩৫টি আসন জিতল, ৮ বছর আগে অবধি যারা রাজ্যের শাসকদল ছিল, তাদের এই নিদারুণ পরিণতির কারণ খুঁজতে হলে আমাদের তাকাতে হবে কিছু তথ্যের দিকে যা সারণি ১-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ১

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট (শতাংশের হিসেবে)

	২০০৪	২০০৯	২০১৪	২০১৯
বামফ্রন্ট	৫০.৮	৪৩.৩	৩০.১	৭.৫
তৃণমূল	২১	৩১.২	৩৯.৮	৪৩.৩
কংগ্রেস	১৪.৬	১৩.৫	৯.৭	৫.৬
বিজেপি	৮.১	৬.১	১৭	৪০.৩

সূত্র: ভারতের নির্বাচন কমিশন

সারণি ১ থেকে স্পষ্ট যে মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট তাদের ভোট শতাংশ ৫০ থেকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশ-এ নামিয়ে এনেছে। এই ১৫ বছরে বামফ্রন্টের উপর্যুপরি নির্বাচনী পরাজয় ঘটেছে, ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে যার শুরু। প্রত্যেকটি নির্বাচনের পরে বাম নেতৃত্ব বলেছেন যে তাঁরা গভীর পর্যালোচনা করবেন। কিন্তু সেই পর্যালোচনা নিজেদের গদি বাঁচানো বাদ দিয়ে আর কোনো কাজে লাগেনি। অশোক মিত্র, ২০১৪ সালের নির্বাচনী ভরাডুবির পরে *আরেক রকম*-এর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন,

> 'তাঁরা নাকি যথাসময়ে নিজেদের ভোটের যথাযথ আলোচনা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যারা পরপর তিন বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, এবং প্রতি বার আগের বারের চেয়েও খারাপ ফল করেছে, তারা অকৃতকার্যতার কারণগুলি খুঁজে বার করতে সমর্থ হবে এটা হাস্যকর।'
>
> —*আরেক রকম*, দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা

আসলে, বাম নেতৃত্ব মনে করেন তাঁরা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত কিছু বাম বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তাই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম কাণ্ড থেকে শুরু করে একের পর এক ভুলের জন্য তাঁরা কখনো মানুষের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। বরং অনেক সময় শীর্ষ বাম নেতারা এও বলেছেন যে মানুষ তাদের ভোট না দিয়ে ভুল করেছে। মানুষও এই অহমিকা দেখে স্তম্ভিত, হতাশ, ক্ষিপ্ত। তাঁরাও বামফ্রন্টকে আর নিজেদের দল বলে মানতে চাননি।

এবারের নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, যেখানে বিজেপি ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮টি লোকসভা আসনে বিজয়ী হয়েছে। ভোটের হিসেব থেকেই দেখা যাচ্ছে যে বামেদের ভোট মূলত বিজেপি-তে গিয়েছে। বিভিন্ন আসনের সমীকরণ নিশ্চিত আলাদা হবে। কিন্তু মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে বাম ভোট যতটা কমেছে বিজেপি-র ভোট প্রায় ততটাই বেড়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় তৃণমূল কংগ্রেসও তার ভোট বাড়িয়েছে। কেন এই পরিস্থিতি হল?

আমাদের রাজ্যে বিজেপি-র উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল সরকারের অপশাসনের এক বিচিত্র আখ্যান এবং বামপন্থীদের সমস্ত গ্রহণযোগ্যতা হারানোর যুগল কাহিনি। তৃণমূলের আমলে মানুষের উপরে যে অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে তার তুলনা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে নেই। একদিকে, বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের উপরে প্রবল আক্রমণ করা হয়েছে, প্রচুর বাম কর্মী শহিদ হয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন। অন্যদিকে, প্রত্যেকটি গ্রামে, পাড়ায়, শহরে, তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতী এবং নেতারা বেলাগাম তোলাবাজি করেছে। কেউ বাড়ি বানাবে, তার জন্য তোলা, কেউ ১০০ দিনের কাজের টাকা পেল, তার থেকেও তোলা, কেউ শৌচাগার বানানোর টাকা পেয়েছে, তার থেকেও তোলা, এমনকী কলেজে ভর্তি হতে বা শিক্ষকের চাকরি পেতেও তৃণমূলকে টাকা দিতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ, ব্যাবসাদার, শ্রমিক-কৃষক সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে তৃণমূলের তোলাবাজি এবং অত্যাচার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভে ফুটছিল। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা এবং ভোটের সময় অবাধ ভোট লুঠ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। মানুষ মনে মনে ঠিক করে নেয়, তৃণমূলকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়ার সংকল্পে কোনো ভুল ছিল না। প্রশ্ন হল তৃণমূলকে হারানোর জন্য বামেদের না বেছে বিজেপি-কে কেন মানুষ বেশি পছন্দ করল। এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু কৃতিত্ব বিজেপি-কে দিতেই হবে। ২০১৪ সালের পর থেকে বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব পশ্চিমবাংলাকে পাখির চোখের মতন নিশানা করে। দপ্তর খোলা থেকে শুরু করে টাকাপয়সা দিয়ে কর্মী সংগ্রহ করে তারা। সমস্ত দলের কর্মী, নেতাদেরকে নিজেদের দলে জায়গা দেয়। তদুপরি চালাতে থাকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক প্রচার। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। রামনবমী, দুর্গাপুজো, মহরমকে কেন্দ্র করে রাজ্যে মুসলমান বিদ্বেষকে ধুঁয়ো দেওয়া হয়। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে প্রচারের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু করে বিজেপি। তার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ বার বার রাজ্যে এসে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়ায় এবং এই বার্তা দিতে সক্ষম হয় যে তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে।

তৃণমূল নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। একদিকে তারা ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পথকে প্রশস্ত করে। অন্যদিকে, হনুমান জয়ন্তী, রামনবমী পালন করতে গিয়ে তারা বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের রাজনীতিকে মান্যতা দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তারা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে এবং দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। বিজেপি-র কাছে এইসমস্ত ভুল রাজনীতির মাশুল তোলা জলভাত। সামাজিক গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে, হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে তারা লাগাতার মুসলমানবিরোধী এবং তৃণমূলবিরোধী প্রচার করতে থাকে। পুলওয়ামার ঘটনার পরে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক জায়গায় উন্মত্ত জনতা বিজেপি-র প্ররোচনায় ফেসবুকে ভারতবিরোধী কথা লেখা হয়েছে বলে বহু মানুষের বাড়ি আক্রমণ করে। পাড়ায় পাড়ায় পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগান তুলে প্রত্যক্ষভাবে বিজেপি-র পক্ষে মিছিল বেরোয়। তৃণমূল দল এবং তাদের সরকার এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। বিজেপি তাদের ধর্মীয় মেরুকরণ ও জাতীয়তাবাদের রাজনীতি সুচারুভাবে চালিয়ে যেতে থাকে। তৃণমূল সরকারের অপদার্থতা এবং বিজেপি-র হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ফসল পশ্চিমবঙ্গে তাদের অভাবনীয় ফলাফল।

কিন্তু বামপন্থীদের দায় বোধহয় আরো বেশি। কারণ তাদের অধিকাংশ ভোট বিজেপি-তে গিয়েছে। প্রথম থেকেই তারা এক অদ্ভুত প্রচার করতে শুরু করে যে তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যে নাকি 'সেটিং' রয়েছে। একের পর এক সভায় মোদী এসে মমতাকে গাল পাড়ছেন এবং মমতা মোদীকে। তারও আগে বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সংঘাত প্রকাশ্য রাস্তায় চলে আসে। এই পরিস্থিতিতে 'সেটিং'-এর অসার তত্ত্ব মানুষ গ্রহণ করেনি। প্রমাণ দাখিল করতে হলে আবার তাকাতে হবে বিজেপি ও বামেদের ভোটের ফলের দিকে। যদি বামেদের প্রচার মানুষ গ্রহণ করত যে বিজেপি ও তৃণমূল একই

মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ তাহলে বাম ভোটাররা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি-কে ভোট না দিয়ে বামেদের ভোট দিত। আবার বামেদের মুসলমান ভোটের একাংশ তৃণমূলের ঝুলিতে যেত না। 'সেটিং'-এর রাজনৈতিক লাইন ভুল ছিল। গোটা দেশে যেখানে বিজেপি-র বিরুদ্ধে মমতাকে একটি মুখ হিসেবে মানুষ দেখছিল, সেখানে এই লাইন কোনো দাগ কাটতে পারেনি।

যা বলার শেষ অবধি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকেই বলতে হয় যে তৃণমূলকে রুখতে বিজেপি-কে ভোট দেওয়া আসলে গরম কড়াই থেকে আগুনে ঝাঁপানোর শামিল। এই লাইনকেই বামেদের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাদের বলা উচিত ছিল যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমাদের ভোট দিন, কারণ দেশে বিজেপি-র মতন ফ্যাসিবাদী শক্তির থেকে বড়ো বিপদ আর নেই। তৃণমূলের উপর রাগ করে গোটা রাজ্যের সর্বনাশ করবেন না, বামেদের উপর ভরসা রাখুন, আমরা তৃণমূলের গুন্ডাগিরি এবং বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উভয়ের বিরুদ্ধেই আপোশহীন সংগ্রাম করব। এই কথা নেতারা বলেননি, কারণ তাঁরা জানতেন যে এই কথা তাঁদের মুখে মানায় না।

বিগত আট বছর ধরে তৃণমূল রাজ্যকে রসাতলে নিয়ে গেছে। বামেরা আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে বিবৃতি দিয়েছেন কিন্তু সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। সারদা, নারদা, সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যু, টেট কেলেঙ্কারি, এসএসসি কেলেঙ্কারি, বেকারত্ব, তোলাবাজি, তৃণমূলের অগণতান্ত্রিক ব্যবহার, কোনো কিছু নিয়েই বামেদের রাস্তায় আন্দোলন করতে মানুষ দেখেনি। কিছু মিটিং-মিছিল হয়েছে, যা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমনকী আক্রান্ত কর্মী সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ সংগঠিত করতেও বাম নেতারা ব্যর্থ হয়েছেন। এই আন্দোলনহীনতার দায় সম্পূর্ণভাবেই বাম নেতৃত্বকে নিতে হবে।

অন্যদিকে, ২০১৪ সালে বামেদের ভোটের ধ্বস এবং বিজেপি-র উত্থানের পরেও বিজেপি-কে নিয়ে বামফ্রন্ট কোনো রণকৌশল নেয়নি। বিজেপি সরকার একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে, বামেরা রাজ্যে চুপ থেকেছে। এমনকী নোট বাতিলের সময় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন খাড়া না করে বাম ছাত্র ও যুবরা ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়ানো মানুষকে জল খাইয়েছে। মানুষ ভেবেছে বামেরা বুঝি এই বিষয়ে বিজেপি-র পাশেই আছে। গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যেও পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে, বামেরা যথারীতি চুপ। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কোনো আন্দোলন তারা করেনি। বেকারত্বের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরেও বামেদের মধ্যে বিজেপি-র অর্থনীতির বিরুদ্ধে কোনো বলিষ্ঠ আন্দোলন চোখে পড়েনি। এনআরসি বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বামেরা কোনো রাজনৈতিক কথা মানুষের কাছে বলেননি। কেন বিজেপি-র এই নীতিগুলির বিরোধিতা করা জরুরি তা বাম নেতারা মানুষকে বলেননি। আবার পুলওয়ামার পরে যখন বিজেপি মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনি আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বা পাড়ায় পাড়ায় উসকানিমূলক মিছিল করেছে, বামেরা কোনো বিকল্প গণজমায়েত করেনি। জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে বামেরা এই নির্বাচনে কোনো প্রভাবশালী প্রচার করেনি। বিজেপি-র বিরুদ্ধে চুপ থেকে বাম নেতারা রাজ্যের বিরোধী পরিসর তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেউ বলতেই পারেন যে বামেদের সংগঠন তৃণমূল আগেই দুর্বল করে দিয়েছে তাই তাঁরা বলতে পারেননি। যুক্তিটি অসার। কারণ ছোটো সংগঠন নিয়েও প্রচার করে সাড়া ফেলা যায়, যার প্রমাণ বামেরাই ১৯৭০-র দশকে রেখেছিল।

ভোটের ফলাফল বেরোনোর পরে দেখা যাচ্ছে যে বামেদের একাংশ ফেসবুকে বিজেপি-র জয়ে আহ্লাদিত— বেশ হয়েছে, তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়া গেছে। আবার কেউ কেউ বলছেন যে মানুষ কোনো দলের কেনা গোলাম নয়। তাদের যদি মনে হয় যে তৃণমূলের অত্যাচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা বিজেপি-কে ভোট দেবেন তবে তাঁরা বেশ করেছেন। অবশ্যই যেকোনো রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়ার অধিকার মানুষের আছে। কিন্তু বছরের পর বছর বাম দলকে ভোট দেওয়া মানুষেরা যখন একটি ফ্যাসিবাদী শক্তিকে ভোট দেয়, তার দায় বামফ্রন্টের নেতৃত্বকে নিতে হবে বই-কী। আর যারা বিজেপি-র জয়ে আহ্লাদিত, তারা বামপন্থী আখ্যা পাওয়ারই যোগ্য নয়। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের উত্থানে যারা আনন্দ প্রকাশ করে তারাও গণশত্রু হিসেবেই চিহ্নিত হওয়া উচিত, তা তিনি যতই লাল জামা পরে থাকুন না কেন।

পশ্চিমবঙ্গ বাম এবং তৃণমূলের অপদার্থতার জন্য এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ দরজায় কড়া নাড়ছে। অনেকেই বলছেন যে আগে তৃণমূল সরুক তারপরে নাকি বামেরা বিজেপি-র সঙ্গে হিসেব বুঝে নেবেন। এই মূর্খরা ত্রিপুরার থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বামেদের উপর যে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তা প্রায় নজিরবিহীন। ত্রিপুরাতেও বামেরা তৃতীয় স্থানে চলে গেছে। ফ্যাসিবাদ কখনো বামপন্থার মিত্রশক্তি হতে পারে না। তার থেকেও বড়ো কথা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ সাধারণ মানুষের জীবনে যেই বিপর্যয় নামিয়ে আনবে, তার পরিমাণ এবং ভয়াবহতা তৃণমূলের অপশাসনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারে যাওয়া মানে তাদের এক বিশাল

মতাদর্শগত জয় এবং বাম গণতান্ত্রিক নীতি আদর্শ সমস্ত কিছুর পরাজয়, এই কথা যাঁরা বোঝেন না, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি বামকে ত্যাগ করবেন ততই বামেদের মঙ্গল। দুঃখের বিষয় হল সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন বাম কর্মীদের একাংশ এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মতামত লিখছে রাজ্যের কোনো বাম নেতাকে বিজেপি-র বিরুদ্ধে দৃপ্ত অবস্থান নিতে দেখা গেল না। বিজেপি-র বিপদ সম্বন্ধে কোনো সাবধানবাণী ফল বেরোনোর পর থেকে এই প্রবন্ধ লেখা অবধি বাম নেতাদের মুখে শোনা যায়নি।

উপসংহার

ভারত তথা গোটা দেশের রাজনীতি এক ভয়াবহ পরিণতির সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্যাসিবাদকে ললাটলিখন মনে করে চুপ করে বসে থাকলে এই দেশটা আর বাঁচবে না। তাই লড়াই জারি রাখতে হবে। তবে, এই লড়াই দীর্ঘমেয়াদি হবে, রক্তক্ষয়ী হবে। এই লড়াই লড়ার জন্য যেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দরকার তা রাজ্যের বাম নেতৃত্বের নেই। কিন্তু লড়াইটা বাম রাজনীতির উপর দাঁড়িয়েই করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান বাম দল বিজেপি-কে যেভাবে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে তারপরে এই আশা করা বাতুলতা যে তারা রাতারাতি নিজেদের পরিবর্তন করে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের বামমনস্ক মানুষকে বিকল্প বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হবে সেই রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

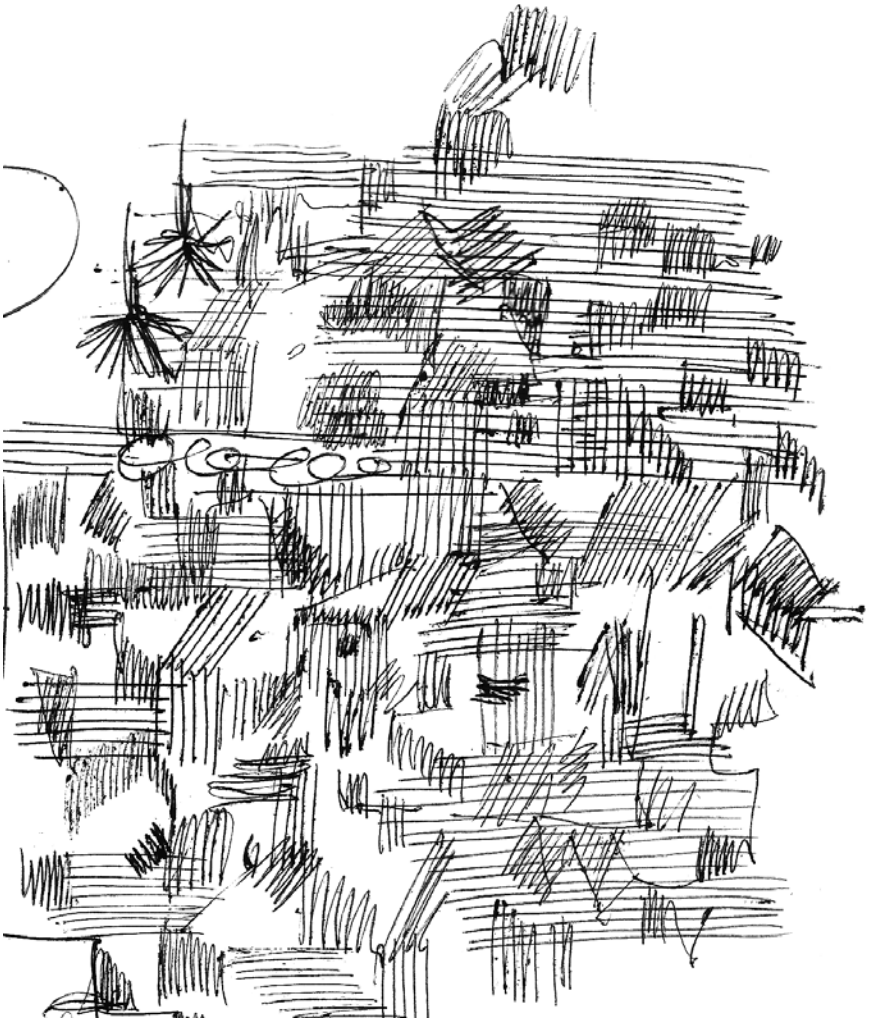

ছবি : ইন্দ্রপ্রমিত রায়

নির্বাচনোত্তর পর্ব ও কিছু কথা

সুজিত পোদ্দার

সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচনের ফল এক অর্থে অপ্রত্যাশিত। বিজেপি শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে তাই নয়, ওরা লোকসভায় ২০১৪ সালে জেতা আসন সংখ্যা ২৮২ থেকে বাড়িয়ে ৩০৩-এ পৌঁছে গেছে। এনডিএ-এর আসন সংখ্যা এখন ৩৩৭। কংগ্রেস দল এককভাবে মাত্র ৫২টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিজেপি দক্ষিণে কর্নাটক এবং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তরে সর্বত্র জয় পেয়েছে। গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বিজেপি সরকার দেশের কোনো অংশের মানুষের জন্য এমন-কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি যার জন্য মানুষ দু-হাত তুলে ওদের সমর্থন জানিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবে। দেশের কয়েকটি বৃহৎ পুঁজিপতি পরিবার বাদ দিলে, বিজেপি গত পাঁচ বছরে ছোটো মাঝারি থেকে অনেক বড়ো ব্যবসায়ীদের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল প্রধানত নোটবন্দি এবং জিএসটি-র যুগলবন্দি ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। নোটবন্দির ফলে গ্রামের কৃষক থেকে শহরের ছোটো বড়ো ব্যবসায়ী, মাঝারি শিল্প সুদ্ধ সকলের ব্যবসায় ভাটা এসেছে। আবাসন ও অন্যান্য নির্মাণশিল্পে মন্দা আজও একইভাবে চালু আছে। তথাপি এইসব মানুষ বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছে হয়তো এই ভেবে, বিজেপি চিরকাল ব্যবসায়ীদের বন্ধু বলে পরিচিত, তাই ওরাই ব্যবসায়ীদের রক্ষাকর্তা হবে। বিরোধীরা মানুষকে অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এমনকী বিহার যেখানে বিরোধীদের সম্মিলিত বা একক শক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য সেখানেও বিরোধীশক্তি তেমন সাড়া আদায় করতে পারেনি ভোটদাতাদের। উত্তরের কর্নাটকে কংগ্রেসকে মানুষের প্রবল প্রত্যাখ্যান, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র উত্থান আগামী দিনে সারা দেশের গণতান্ত্রিক মানুষের চিন্তার কারণ হয়ে থাকবে।

দেশের এক শতাংশ মানুষ যারা উচ্চবিত্ত বড়োলোক, ওদের কাছে কোনো সরকারই চিন্তার কারণ হয় না। কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এই দুই দলই স্বাধীনতার পর থেকে আগে-পরে সরকার চালিয়েছে। কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এসে স্বাধীনতার পর থেকে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম সংবিধান প্রণয়ন, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীন সত্তা তৈরি করা। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পঞ্চায়েতিরাজ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন এরকম আরো অনেক সংস্থার মাধ্যমে ন্যায় বিচারের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। আশঙ্কার কারণ আছে, আজ দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে ক্ষমতাসীন দলের চাপে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য একের পর এক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ অথবা অকেজো করা হতে পারে।

কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক মুখ যেমন মনে রাখার প্রয়োজন আছে, তেমনি একথাও স্মরণে রাখতে হবে, কংগ্রেসও বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী বুর্জোয়া দল। স্বাধীনতার পর থেকে এই দলই অধিকাংশ সময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকেছে। দেশের সম্পদ কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়েছে। আর্থিক বৈষম্য প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। গরিব আরো গরিব হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, গরিব মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ কমেছে। বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি-র শাসনে সারা দেশে কৃষকের অবস্থা অসহনীয় হয়েছে। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার লোকদেখানো কিছু ঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করছে। কিন্তু এই দয়ার দান কৃষকের সংকট দূর করবে না। তাঁরা চান ফসলের ন্যায্য দাম। শিল্পের উৎপাদন বাজারে বিক্রি হয় এমন দামে যাতে উৎপাদনের খরচ মেটে এবং মুনাফাও থাকে। কিন্তু কৃষকের বেলায় সরকার ধান, গম, পাট ইত্যাদির মতো কিছু ফসলের ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য ধার্য করে। কিন্তু সরকারের সহায়তায় যথাসময়ে বাজারে বিক্রি না হলে, কৃষক অভাবের তাড়নায়, খুব কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বাজারে কিছু ফড়ে এই ফসল সস্তায় কিনে, প্রয়োজনে গুদামজাত করতে

পারে। ফড়েদের এই অর্থের বল আছে। কিন্তু কৃষক ফসল উৎপাদন করে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু অভাবের তাড়নায় বাজারে ফসলের যে দাম পায় কৃষককে সেই দামেই বিক্রি করতে হয়। এর ফলে চাষের খরচও তোলা সম্ভব হয় না অনেকসময়। এই অবস্থা চলে আসছে বহুদিন থেকে। প্রথমে ফসলের উৎপাদন কমছিল তাই বাজারে ফসলের আমদানির তুলনায় চাহিদা বেশি ছিল। তখন বাজারে ফসল বিক্রি করে কৃষক মোটামুটি ভালো দাম পেত। এখন উন্নততর সার, উন্নত বীজ ইত্যাদির ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের খরচও বেড়েছে। কিন্তু ন্যায্য দামের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি চাষিদের স্বার্থরক্ষার জন্য। গত পাঁচ বছরে মোদী সরকারের আমলে কৃষকের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ঘোষণা করা সহজ, কৃষকের ফসলের বিক্রয়মূল্য উৎপাদিত মূল্যের দ্বিগুণ করা হবে। শুধু সরকারি নির্দেশে এই কাজ করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এখন সারা দেশে নির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা চালু আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করতে হবে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে। শুধু প্রশাসনকে দিয়ে এই কাজ করা সম্ভব নয়। দলীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কিন্তু কোনো সংকটই বাধা নয়, যদি সদিচ্ছা থাকে। দলীয় রাজনীতিতে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, এর উৎস কিন্তু উপরতলায়। মাথায় পচন শুরু হলে এই ব্যাধি নীচে নেমে আসে। এখন রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্রই এই চিত্র কম-বেশি বিদ্যমান। এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা নিতে হবে। যেকোনো ভালো পরিকল্পনা শুরু করলে অবশ্যই একদিন এর সুফল পাওয়া যাবে। যেমন ১০০ দিনের কাজ। সারা দেশের গরিব মানুষ প্রতি বছর এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় গ্রাম শহরের রাস্তাঘাট, বাজার, কৃষি, ছোটো ব্যাবসা ইত্যাদি আরো অনেক কাজের মাধ্যমে গরিব মানুষের অনেক উপকার হচ্ছে। সরকারি পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত বাজার (regulated market) আরো বেশি তৈরি হলে কৃষক সরাসরি এই ফসল পাইকারদের হাতে অথবা খুচরো বিক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পারবে। তৈরি করতে হবে অনেক হিমঘরও। যাতে অন্যান্য অর্থকরী ফসল, যেমন আলু, পেঁয়াজ, টম্যাটো ইত্যাদি হিমঘরে সহজে রাখা যায়। এইভাবে তৈরি হবে ছোটো শিল্প, ব্যাবসা ইত্যাদি। নতুন প্রজন্ম চাষবাস ছাড়া অন্য কাজেও যুক্ত হতে পারবে। গ্রামে-গঞ্জে, ছোটো শহরে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের চিত্র খুবই হতাশাজনক। উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগের অভাব শুধু গত পাঁচ বছরের বিজেপি জমানায় নয়, এর পূর্বসূরি কংগ্রেস দলের দশ বছরের শাসনকালেও ইস্পাত, লোহা, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। এইসব শিল্প তৈরি হলে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ অনেক মজবুত হয়, অনুসারী শিল্প তৈরির সুযোগ হয়। ভারী শিল্পে বিনিয়োগের অভাবে যে-সমস্ত মেধাবী ছাত্র প্রতি বছর বিভিন্ন নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভ করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হচ্ছেন, তাঁরা শিল্পে চাকরির সুযোগের অভাবে, মোটা বেতনের চাকরি নিচ্ছে আইটি কোম্পানিতে, অর্থকরী প্রতিষ্ঠানে বা বিদেশি অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থায় চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। সত্যিকারের দেশ গড়ার কাজে এদের মেধা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। উদার বাণিজ্যনীতির সুবাদে দেশে কিছু নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং এখনও কিছুটা ধীর গতিতে হলেও এই ধারা বজায় আছে। অবাধ বাণিজ্যের হাত ধরে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ হচ্ছে, খুচরো ব্যবসায় মোটরগাড়ির ব্যবসায়, সিমেন্ট, যোগাযোগ, পরিকাঠামো তৈরি ও নির্মাণ প্রকল্পে। এইসব বিনিয়োগের হাত ধরে বহু নতুন চাকরির সুযোগও তৈরি হয়েছে। অবাধ বাণিজ্যের ফলে উন্নত দেশগুলোতে কাজের সুযোগ ক্রমে সংকুচিত হতে আরম্ভ করেছে। ওইসব দেশও ক্রমে অবাধ বাণিজ্যের উলটোদিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। ওরা ওদের দেশের বাজার বিদেশে তৈরি দ্রব্যের জন্য অবারিত রাখার বিপক্ষে সরব হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমেরিকার সরকার এই ব্যাপারে সরব হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশে বিনিয়োগ এবং চাকরির সুযোগ সংকুচিত হতে থাকবে। তাই স্বনির্ভর হওয়ার দিকেও আবার নতুন সরকারকে নজর দিতে হবে।

নতুন সরকারকে নতুন কর্মসংস্থান-এর কথা যেমন ভাবতে হবে, তেমনি ভাবতে হবে যে-সকল সরকারি সংস্থা ইতিমধ্যে রুগ্‌ণ হয়ে খুঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে অথবা চলার গতি স্তব্ধ হয়েছে, ওদের কথা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম— দুটি বিমান সংস্থা, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত এয়ার ইন্ডিয়া। একসময় এর দেশের বাজারে একাধিপত্য ছিল। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে বহু বেসরকারি দেশি বিদেশি বিমান পরিবহণ সংস্থা বাজারে হাজির হয়েছে। এখন আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলে এদের আধিপত্য প্রায় নব্বই শতাংশ। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া বাজার হারাচ্ছে নতুনদের কাছে। সরকারি বিমান সংস্থার ঋণের বোঝা ক্রমবর্ধমান। নিজের বাজার ধরে রাখতে পারছে না। এখন এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে একদিন একে বন্ধ করে দেওয়াই যুক্তিসংগত মনে হবে। একসময়ে সবচেয়ে বড়ো

বেসরকারি বিমান পরিষেবা সংস্থা, জেট এয়ারওয়েজ এখন ঋণগ্রস্ত। পরিষেবা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সংস্থা নিলামে বিক্রির জন্য দর পাচ্ছে না। এই সংস্থাকেও সরকারি হস্তক্ষেপেই বাঁচানো সম্ভব। এরকম আরো অনেক সরকার পরিচালিত বিভিন্ন শিল্পে বহুল পরিচিত নাম ছিল। এখন সেগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। এইসব বেসরকারি এবং সরকারি শিল্পসংস্থায় হাজার হাজার দক্ষ মানুষ বহু বছর যাবৎ বিভিন্ন কাজে যুক্ত। এইসব মানুষজন এবং এদের পরিবারের কথা ভেবে, নতুন সরকারকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে অনতিবিলম্বে। অতীতের অনেক সরকারই পুরোনো শিল্পসংস্থার কথা ভাবেনি। পুঁজিবাদী দল নতুন পুঁজির খোঁজে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। নতুন বিনিয়োগে আধুনিক শিল্প অনেক অল্প লোক নিয়োগ করে অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা রাখে। আমাদের দেশে দক্ষ মানুষের অভাব নেই, চাই কাজের সুযোগ। অবাধ বাণিজ্যের মূল কথা, মুনাফা বাড়াতে হলে কম মানুষকে দিয়ে বেশি কাজ করাতে হবে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে। যেমন অন-লাইনে সব কাজ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এইসব সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের পক্ষে ভয়ংকর আত্মঘাতী নীতি। পাঁচ বছরের মেয়াদে সরকার মানুষের কথা না ভেবে পাঁচ বছরে দেশকে অরাজক অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সচেতন জনমতই পারবে নতুন সরকারকে এইসব দিকে নজর নিতে। পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে দেশে বেকারের সংখ্যা এক কোটি থেকে দু-কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দেশে কয়েকটি মাত্র উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ভালোভাবে নিয়মিত লেখাপড়া হয়, তারা দেশে বিদেশে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে। এইসব নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পাওয়া ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, সেখানে শুধু অরাজকতা। কতিপয় সুবিধাভোগী ছাত্রের দৌরাত্ম্যের ফলে অধিকাংশ নিরীহ ছাত্ররা স্বাভাবিক পঠনপাঠন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে আমাদের সমাজে আগামী দিনে শুধু গুন্ডা, দুর্নীতিবাজরাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার এবং সকলে মিলে এই ব্যাপারে জনমত তৈরি করতে হবে। কেউ জন্মের পরই গুন্ডা তৈরি হয় না। যখন সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত যুবক-যুবতীর ভিড় হয়, কিন্তু নতুন কাজের সুযোগ ক্রমসংকুচিত, তখন এই পরিস্থিতিতে জন্ম হয় হুল্লোড়-দাঙ্গাবাজদের। অনেক রাজনৈতিক দল এইসব যুবকদের কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলে এবং নিজেদের শাসন ক্ষমতাকে বজায় রাখতে কাজে লাগায়। সমাজকে অরাজক অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন প্রভূত নতুন কাজের সুযোগ। আরো বেশি শিক্ষার সুযোগ, স্কুল-কলেজে সত্যিকারের নিয়মিত পঠনপাঠন। দায়সারা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার তৈরি করা নয়। আজকাল, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বদলে কিছু পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বা পাইয়ে দিয়ে সংবাদমাধ্যমে সাড়া জাগানো হয়। যুবকদের এককালীন কিছু পাইয়ে দিয়ে ওদের নৈতিক অধঃপতনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এইসব পাইয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক আবর্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

নির্বাচনের ফল এনডিএ-র পক্ষে। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফায় এনডিএ পরিচালিত সরকার গঠিত হয়েছে। কিছু নতুন মুখ এবং কিছু পুরোনো মুখ আরো ওরজনদার দফতরের দায়িত্ব নিয়ে সামনের সারিতে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী বিজেপি দলের নবনির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের সভায় দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। তিনি নির্বাচনের সময় যেমন গত পাঁচ বছরে কী কাজ করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে বিদায়ী সরকারের সাফল্যের নিরিখে জনগণের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেননি, তেমনি আগামীদিনে যুবসমাজ নতুন সরকারের কী প্রত্যাশা করবে তার কোনো দিশা দেননি। মানুষকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিবেশী বেনামে মিলিটারি চালিত সরকারের জুজুর ভয় দেখিয়ে ভোট পাওয়া সহজ কিন্তু ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে কিছুমাত্র আশার বাণী দেওয়া অনেক কঠিন কাজ। মোদী আগামী পাঁচ বছর কঠিন পথে হাঁটবেন কিনা তিনিই ঠিক করবেন। কিন্তু গত পাঁচ বছর বিজেপি শুধু দেশের অর্থনীতিতে বেহাল অবস্থা তৈরি করেছে তাই নয়। ওরা দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে বার বার আঘাত করেছে। ওরা বিভাজনের রাজনীতি করে, সংখ্যালঘুদের স্বাধীন ধর্মপালনে আঘাত এনেছে বারে বারে। বিজেপি সরকার আইন করে গো-হত্যা বন্ধ করতে চাইছে শুধু মুসলিমদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত আনার জন্য। বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, এখানে রামমন্দির তৈরির জন্য আইন আনার চেষ্টা করবে। কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ কিছু মর্যাদা রক্ষার কথা আইনে দেওয়া আছে। যেমন উপত্যকায় সম্পত্তির অধিকার শুধু স্থানীয় মানুষেরই থাকবে। কিন্তু বিজেপি নির্বাচনের প্রাক্‌কালে ঘোষণা করেছে তারা ফিরে এলে, এইসব উপত্যকার মানুষের বিশেষ অধিকার কেড়ে নেবে। বিজেপি হিন্দুত্বের নামে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করতে চায়। যেকোনো কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকবে। এরা গণতন্ত্রে, ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস করে না। ভারতের এই বিশাল দেশ— কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আসাম থেকে গোয়া, দমন, দিউ, নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা আচার অনুষ্ঠান, নানা ধর্ম— এই সকল জনমানুষকে নিয়েই ভারত। বিভাজনের রাজনীতি

করে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। চালাকি দ্বারা কখনোই মহৎ কাজ হয় না। কিছু মানুষকে কিছুদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়। কিন্তু সব মানুষকে সবসময় বোকা বানানো যায় না।

আমাদের পরিতাপের বিষয়, দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশা দেখাতে পারেনি। শুধু বিজেপি সরকারের পাঁচ বছরের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেছে। নিজেরা বার বার একত্র হয়ে সভা করেছে। কিন্তু কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং নির্বাচনী বোঝাপড়া করে একসঙ্গে বিজেপি-র গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের মোকাবিলা করবার প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষকে দিতে পারেনি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে কিছু ব্যক্তির সমালোচনাও থাকবে। কিন্তু এইবারের নির্বাচনে উচ্চপদাধিকারীরা যেভাবে ভাষা প্রয়োগ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছে, এ খুবই পরিতাপের বিষয়।

সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচন সারা দেশে বিরোধী দলের যে রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছে, এককথায় সাধারণ মানুষের কাছে খুব হতাশার কারণ। এখন কাদা ছোড়াছুড়ির সময় নয়। তথাপি বলব, রাহুল গান্ধীর আমেঠির পরে ওয়েনাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্তকে নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বিজেপি দল আবার ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অ-বিজেপি সরকারকে গদিচ্যুত করবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছে। টাকার বিনিময়ে বিরোধী দলের বিধায়ক, সাংসদদের দলবদল করিয়ে দেশে বিরোধী দলের রাজ্য সরকার শূন্য করার চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছে। চিন্তার কারণ থাকবে এই রাজ্যের কথা ভেবেও। রাজ্যে বিজেপি দলের অগ্রগতি, যেকোনো গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে আতঙ্কিত করবে। রাজ্যের সব রাজনৈতিক দল, বিশেষত বামপন্থীদের এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্যের গ্রাম শহর সর্বত্র মানুষকে বোঝাতে হবে তাদের বিপদের কথা। তারা আমাদের রাজ্যের মানুষকে ভুল পথে চালাতে সক্ষম হয়েছে কিছু পরিমাণে। বিজেপি-র বিভাজনের প্রচার মানুষকে কাছে টানতে সক্ষম হয়েছে। এই রাজ্যের মানুষের কাছে বিজেপি অনেকটা অচেনা দল। ওরা হিন্দুত্বের নামে মানুষের সমর্থন আদায় করে, ক্ষমতার লোভে ধীরে ধীরে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে। এই অবস্থার জন্য রাজ্যের শাসকদলকেই দায় নিতে হবে। দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় ওদের ওই অদূরদর্শিতার মাশুল রাজ্যের মানুষকে অধিক দিন বইতে হবে। এখনো অ-বিজেপি দলের নেতা নেতৃদের কথায় দেশের সামনে উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দুত্ববাদী দলের বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নের কথা শুনতে পাওয়া যায় না। আগামী দিনে এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে না পারলে দেশের অভিমুখ অনিশ্চয়তার অবস্থার দিকেই এগোতে থাকবে। আজ সংখ্যালঘুরা ভীতসন্ত্রস্ত, বাকিরা এই ব্যাপারে উদাসীন। আজ যে বিপদ সংখ্যালঘুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী দিনে গণতন্ত্র হরণের বিপদ সারা রাজ্যের এবং সারা দেশের মানুষকে গভীর অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে। সারা দেশের বামপন্থীরা এতটাই কোণঠাসা, ওদের ওপর ভরসার কথা ভাবা কঠিন, তথাপি বামপন্থীরাই একমাত্র নীতিনিষ্ঠ দল, যত সীমিত শক্তিই থাকুক তাদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে এই কঠিন পরিস্থিতিতে।

১৪ মে ২০১৯ : জ্ঞানের বিহনে...

সুমন ভট্টাচার্য

কালো, তা সে যতই কালো হোক

সভ্যতা সর্বদাই প্রস্তুত। যা প্রস্তুত নয়, তা পর্যায়গণ্য নয় সভ্যতারও। কিন্তু ১৪মে ২০১৯ যা ঘটল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর দরজা থেকে বিদ্যাসাগর কলেজের চত্বরের প্রত্যক্ষে, তেমন ঘটনাকে কল্পনা করবারও প্রস্তুতি কি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতবর্ষের গড়-সচেতন নাগরিকের মধ্যে? এবং ঘটনাটি অপ্রস্তুতও করল নাগরিকদের। ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আর সভ্যতারও ধারণা!

লোকসভা নির্বাচনের প্রচার-পর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম নেতা-র একটি প্রচার-মিছিল থুড়ি অধুনা আর মিছিল হয় না— 'রোড শো'-কে কেন্দ্র করে এই ঘটনা। বিরুদ্ধ পক্ষ অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এই মিছিল বা রোড শো-এর সামনে দেখাতে চায় কালো পতাকা। এবং সেই কালো পতাকাকে আড়াল করবার উৎসাহে ঘনিয়ে এল আরেকটি কালো দিন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকেই সংঘর্ষের শুরু। মতানৈক্যের বহিঃপ্রকাশ— মত প্রকাশে মৌখিকতাকে পরিহার করে নির্বাচন করে নিয়েছে প্রত্যক্ষ আক্রমণের ব্যবহারিক। প্রথম প্রশ্ন এখানে যে, নির্বাচনী প্রচারেও অসুবিধা নেই, কালো পতাকা প্রদর্শনেও না! গণতন্ত্রে মানুষের যাবতীয় অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। যুক্তিসিদ্ধ হলে, অধিকার আছে তাকে খণ্ডনেরও। তাহলে কি বদলে গেছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারও সাধারণ নিয়ম?

প্ররোচনা ছিল। এবং— সম্ভবত— সংঘর্ষ— সংগঠনের বা সংঘটনের আকাঙ্ক্ষা এবং ইন্ধনসহ প্রস্তুতিও ছিল উভয়পক্ষের। তারই লাক্ষায়— 'কোথাও ধর্ম, কোথাও রাজ্য'-র অধিকার তথা ক্ষমতার কুর্সি-কবজাদারির মরণকামড়ে নিশ্চিহ্ন হল, যাবতীয় সভ্যতা-সৌজন্য, বড়ো বালাই, ন্যূনতম নিয়মকানুনেরও আলগা হয়ে আসা খুঁটি। মিছিলের মুখ— না-কি রোড শো-র আক্রমণাত্মক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ— 'headpiece filled with straw'—ঢুকে যায় বিদ্যাসাগর কলেজের অভ্যন্তরে— চলে দর্পিত ভাঙচুর যার অন্যতম— বিদ্যাসাগরের মূর্তি।

লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ

এই ঘটনা ঠিক কারা ঘটাল, সে প্রশ্নটি মুখ্য এবং গৌণ। একইসঙ্গে। কারণ ঠিক যাদের হাতে ঘটেছে— প্রত্যক্ষ দায় তাদের। অপরাধ তাদের। কিন্তু যা ঘটল, বা ঘটতে পারল, তার প্রত্যক্ষ দায় সকলেরই। লক্ষণীয় যাদের হাতে এই ভাঙচুর, তার সিদ্ধান্ত বা নির্দেশিকা কার বা কাদের, তার দায় নেবে কেউ? বরং যাদের হাতে ভাঙল, ধরা পড়লে তাদের শাস্তি আছে— কিন্তু প্রত্যক্ষ লাভ? তা যে দূরের গণিত! কারণ, বলা বাহুল্য— যা ঘটেছে, তা একটি বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলা যাবে না। তা বহুদিনের অনেক অনেক ঘটনার একটি সম্মিলিত যোগফল। এখানে বিদ্যাসাগর কলেজ— একটি ভৌগোলিক অবস্থান। বিদ্যাসাগরের মূর্তি আরেকটি শ্রদ্ধার্ঘ্যের প্রতীকী অবস্থান। আর সামগ্রিক ঘটনার রূপ একটি সামাজিক পরিণতির বিপজ্জনক রূপক। যদি সমাপতন বলা হয়, সেক্ষেত্রেও যে কাকতালের মোক্ষম ত্রিবেণী সঙ্গম। প্রথমত, বিদ্যাসাগরের মূর্তি। দ্বিতীয়ত, স্থান— বিদ্যাসাগর কলেজ এবং বৃহত্তরভাবে কলেজ স্ট্রিট চত্বর! তৃতীয়ত, কাল— বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ-রেখা।

যেভাবে আগে, কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির শিরশ্ছেদ ঘটেছিল, অন্যায় হলেও তা ছিল কার্যক্রমের পরিকল্পনার অঙ্গ। কিন্তু— এই দুষ্কর্মটির উৎসে পরিপূর্ণ ভ্যান্ডালিজম। আক্রমণকারীরা চেয়েছে কিছু ধ্বংসাত্মক বিনষ্টিসাধন। তা-ই করেছে তারা। সেখানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে— রবীন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জন বা ক্ষুদিরামের মূর্তি থাকলেও বাদ যেত না! আবার এও হওয়া খুবই সম্ভব যে, ওটি বিশেষভাবেই বিদ্যাসাগরের মূর্তি— তাও চিনতে পারেনি তারা!!

প্রশ্নটা এখান থেকেই— যে কারা করল তা মুখ্য হয়ে যায়,

কেন করল বা কেমন করে করতে পারল— এই প্রশ্নে। এই জিজ্ঞাসায়। যদি একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-সাক্ষরতার পরিসংখ্যান নেওয়া যেত জমায়েতি জনতার— তো সেখানে সম্ভবত নিরক্ষর পাওয়া যেত না কাউকেই। আর গড়-প্রাতিষ্ঠানিকতায় দশম বা দ্বাদশোত্তীর্ণ অধিকাংশই— স্নাতকও হতেই পারেন। অর্থাৎ তার পরেও একটি শিক্ষাঙ্গনকে তার মর্যাদায়, alma matter-এর পরিচয়ে ভাবতেও পারেনি তারা!! কেন?

সেই রোড-শো-র যেটুকু টুকরো টুকরো ছবি দেখা গেছে— মাথায়, এই প্রগাঢ় ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলীতেও চমৎকার উষ্ণীষ-শোভিত বীরবৃন্দের, গড়-বয়স পঁচিশ-তিরিশ। অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা শেষ ও জীবিকাসন্ধানী। পঁচিশের নীচে হলে, হতেও পারে ছাত্রাবস্থা বহমান। আর ত্রিশোর্ধ্ব হলে জীবিকা-সন্ধানেও হতাশা প্রান্তিক।

কোনো নির্বাচনী প্রচার-মিছিলের অংশী মানেই যে সে বা তারা কর্মহীন এমন নয়— থাকতে পারে কর্মরত মানুষও, ছোটো বা মাঝারি ব্যবসায়ীও, অথবা উচ্চপদ চাকুরেও অসম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশই সম্ভবত— শেষপর্যন্ত জীবিকা-সন্ধানী এবং তারই আশায় ক্ষমতাসীনের কাছে আনুগত্যের প্রমাণ দেওয়ার 'সোহাগমদে দোদুল কলেবর'। এই অবস্থানটাই প্রশ্নের। এবং উত্তরোত্তর আশঙ্কার।

অনেকদিন পর্যন্তই— ধরা যাক গত শতকের নয়ের দশকের প্রথমার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমার্ধ পর্যন্তও শিক্ষিত হওয়ার দিকে একটি সচেতন প্রয়াস ছিল। তার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড়ো অংশকে আত্মনিয়োগও করতে হত যথাসামর্থ্য। কিন্তু ক্রমশ, পরীক্ষাগুলির মানগত অবনমন এবং উত্তরপত্রের পরীক্ষণেও সমূহ শৈথিল্য— প্রমাণ করা যাবে না, যাঁরা অভিজ্ঞতায় জানেন, স্মরণ করুন— একদিকে নম্বর-করোজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বা পরিসংখ্যান উজ্জ্বল করেছে, অপরদিকে ক্রমশ নামিয়েছে মেধাপ্রয়োগের প্রবণতা।

পাঠ্যক্রমকে মগজস্থ করে তাকে পরীক্ষার খাতায় নির্ভুল উগরে দেওয়াটা স্মরণশক্তির দক্ষতা হতে পারে, কিন্তু মননশক্তির নয়। এই ব্যবস্থায় স্বল্পতর পাঠক্রিয়ায়, উচ্চতর বা উজ্জ্বলতর ফললাভে যারা নন্দিত হল, তাদেরও অধিকাংশের আত্মপ্রসাদ আসে যে, তারা সকলেই ঊর্ধ্বতনসিদ্ধ যোগ্যতম! এখানে এদের দোষ নেই। কিন্তু যে কারণে এই নম্বরপ্রাপ্তির আয়োজন— এই জীবিকারই যেখানে সন্ধান নেই, তখন এদের অবস্থা কেমন?

তদুপরি, আটের দশকের শেষ ভাগ বা নয়ের প্রথম ভাগ থেকেই বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়— শ্রেণিকক্ষের সমান্তরালে, ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা নব্বই বা পঁচানব্বই ভাগকেই গ্রহণ করতে হয়েছে, দাদাবাবু-দিদিমণিদের কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত পাঠদান। সেখানে দরিদ্র বা হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানও বাধ্যই হয়েছে প্রায়। এর পরেও কলেজে ভর্তির সময় পুনর্বার 'তোলা'-র দোলা। এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও যখন আর্থিক বিনিময়ের কৃষ্ণকলি-র ক্রমবিকাশ ক্রমশ প্রকাশিত, তখন হতাশা বোধ করা সেইসব তরুণদের কথা কতটুকু বিবেচিত?

যারা এই ব্যবস্থার মধ্যেও পেয়েছে, তারা আর প্রশ্ন করেনি এই পদ্ধতিকে, যারা পায়নি, তারাও দীর্ঘকাল মুখ খুলবার জায়গা পায়নি তেমন। কিন্তু ধরা যাক ১৯৯৮ থেকে ২০১৮— এবং ২০১৮, এবং ২০০৮ থেকে ২০১৮— এই, যথাক্রমে কুড়ি বছরের অবসন্নতা ও দশ বছরের প্রত্যাশা ক্লান্তির যোগফল তো খুব কম হবে না! এদের কারও ভেতরেই কিন্তু শিক্ষাস্ত্র বা শিক্ষকবর্গ— কারোর প্রতি কোনো আন্তরিক সম্মান নেই! গড়ে ওঠেনি। কারণ শিক্ষককুল, অর্থগ্রহীমাত্র, শিক্ষাক্ষেত্রটি শুধুই নাম-লেখানোর ঘাঁটি বা ছুঁয়ে থাকবার বুড়ি। ফলে সেখানে এবার 'বুরি নজর' দিলেও— কালিমালিপ্তির সম্ভাবনাও নেই। খুবই কঠিন কথা। মিথ্যে হলে এই পাঠকই আনন্দিত হবে সর্বাধিক।

যথাযথ শিক্ষা, শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে, যুক্তিক্রম দিয়ে সমগ্র বিষয়কে বিশ্লেষণের চেষ্টায়। সেখানে সক্রিয় থাকে যাচাই করে নেওয়ার মন। সে বা তারাই ছাত্র— যারা শিক্ষাদাতার ত্রুটিকে ছত্রসম আড়াল করতে পারে। সেখানে পর্যায় আসে শিক্ষাদাতারই শিক্ষার্থী হয়ে ওঠার— পঠনপাঠন— জ্ঞানচর্চা এগোয় প্রজ্ঞার দিকে। অপরপক্ষে শিক্ষকের হাঁচিটি সুন্দর, কাশিটি সুন্দর, নাক ঝাড়াটিও মেজদার খাতায় নথিবদ্ধ করে রাখবার মন নিয়ে গড়ে ওঠে শিষ্যকুল। এখানে আর পরম্পরার অগ্রগতি নেই— তা চক্রাবর্ত, দাগা বোলানোর খেলা।

এরই মধ্যে যখন যে রাজনৈতিক পক্ষ ক্ষমতায় আসতে চান বা আসেন, তাঁদেরও 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বেকারত্ব মোচনের আশাপূর্ণা-দৈববাণী। বাণী ঠিকই আছে— কিন্তু বেকারত্ব মোচনটা যখন দৈবাৎ-ই ঘটে, অন্তত ঘটনাধারা যখন তাই দেখায়, তখন 'দেবতার জন্ম' আর 'দানবের জন্ম' স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার হাতে হাতে ধরি ধরি নাচের আসর। সুতরাং মৌখিক প্রতিশ্রুতির শুকনো চিঁড়ে যারা উন্মোচিত ধর্মতত্ত্বের— revealed theology-র প্রত্যক্ষ পানীয়ে বা জলীয়তায় ভেজাতে পারবার বিশ্বাস বা আস্থা জাগাতে পারে, সেখানে 'দৈবের হাতে হাত বেঁধে চলা মহাসিন্ধুর ডাকে/সর্বসমর্পণ'-ই হয়ে যে উঠবে অবশ্যকৃত্য— সেখানে আশ্চর্যের নেই কিছুই!

সুতরাং একদিকে শিক্ষার এবং শিক্ষাসত্রের গুরুত্ব বিষয়ে

বিতৃষ্ণা, বিমূঢ় অজ্ঞানতা, বা সচেতন অথবা অবচেতন ঈর্ষা, আর অপরদিকে অলৌকিকত্বে আস্থাশীল তথাকথিত 'ধর্ম'-বিশ্বাস-এর যোগফলটিকে মান্য না করে কী উপায়!!

এখানে কোনো বিশেষ দলকে দায়দায়িত্ব সমর্পণও অনেকটা ভ্রান্তিকর। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত মিছিলগুলিতেও নয়ের দশকের উপান্তপর্ব থেকে দেখা গেছে প্রায় সমদর্শন মিছিল— বিশেষত, একুশ শতকের বাইকবাহিনী। শুধু উগ্রতার পরিসর সংবর্ধিত হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদের মোক্ষমে।

এই ঘটনাটি— রাজনৈতিক। অর্থাৎ দলগত স্বার্থচালিত। এখন তা নলিনীদলগত না লঘুবংশানুগত— কার কতটা রাজনৈতিক ফায়দা তুলবে— তাই এখন বেশি আলোচিত। কিন্তু 'দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে' আর সেই ত্রিশঙ্কুদের দিয়ে যা করিয়ে নেওয়া যায়, আর তারাই-বা কেমন করে করে— তার কারণটা বোঝা দরকার। ব্যবহার্য হওয়ার 'নিয়তির' পাপচক্র।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য— এই রোড শো-র অংশীরা বহিরাগত। হতেই পারে। সুতরাং তাদের কাছে বিদ্যাসাগর কলেজের গুরুত্ব বা খোদ বিদ্যাসাগরমশায় অপরিচিতই। Times of India-র সাংবাদিকও তো বিদ্যাসাগরের পরিচয় দেন বাংলা প্রাইমার রচয়িতা বলেই (Times of India, 15.05.2019, P-1)! তারপরও প্রশ্ন থাকে— সে মিছিলে, বাঙালি কর্মীও কি ছিল না? তারাও কি অন্তত ওটুকু ঠেকাতে পারত না? না। তার কারণ— শিক্ষাগ্রহণের যথাযথ মাত্রার সঙ্গে, কালের মাত্রার সঙ্গে, কালের যাত্রার যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে, তার পুনর্যোজনা দুঃসাধ্য।

এই ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রস্তুতি যে ছিল না— তা নিশ্চিতভাবেই অপ্রস্তুতদের অ-সভ্যতাই! কিন্তু এই বারণাবতের যে উৎসবে শহর মাতল— এবার তার পৌনঃপুনিক দেখবার প্রস্তুতির 'সভ্যতা'-ই কি তবে অর্জন করতে হবে?

না কি, আবার ফিরে তাকাবার ব্রতপ্রয়াসে আমরা মনোযোগী হব— যে শিক্ষা— অন্তরের, বিচার-বিবেচনার আহ্বায়কের, তার দিকে? দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য তো নয়। এখনও।

আর যা বলুক অন্য লোক

বিদ্যসাগরের মূর্তি ভেঙে বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের ক্ষতি হয়নি কোনো। তাঁর অস্থিভঙ্গের আয়োজন ছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। কিন্তু একটি প্রশ্ন— যদি সেখানে থাকত একটি স্বামী বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণের মূর্তি, তাহলেও কি তা ভাঙচুর করা হত? নিশ্চিতভাবেই না। কারণ, ভঙ্গকর্মীরা ওইটুকু জানে যে তা করলে পার পাবে না। এমনকী দোষারোপের চাপান-উতোর খেলাও ভেস্তে যেতে পারে গোড়াতেই। সুতরাং গায়ত্রী-বিস্মৃত সেই 'বিটলে বামুন'-কে চুরমার করলে বোধহয় তা তেমন দোষের কিছু না! এবার প্রশ্ন, যদি সেই মিছিলের অংশীদের কারও মধ্যে, অধ্যয়ন নামক ক্রিয়ার প্রতি, জ্ঞান-নামক একটি পরম উপাস্যের বিষয়ে সাধারণ ধারণা বা শ্রদ্ধাও থাকত তাহলেও কি ঘটত এই ঘটনা? না। একই শ্রদ্ধার সংস্কারে ঝংকৃত হত সেই আক্রমণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সেই সংস্কারটুকুও অনুপস্থিত! এখানে ভবিষ্য-আতঙ্কের দুর্বিপাক। আর এখানেই ক্রমশ ঘনীভূত হয় দুর্যোগের সংঘটিত আর সমাসন্ন রূপক— কোনো প্রশাসনই আর শিক্ষিত নাগরিক চায় না— প্রশাসনিক গণতন্ত্র চায়, যে গণ-এর অর্থ পিশাচ— তাদেরই গরিষ্ঠতা, তাদেরই মারণ-উচাটনতন্ত্রী তন্ত্রাচার।

মোদী সরকার ও সমন্বয়ী ভারত

গৌতম রায়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে ভোটপর্ব শেষ। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। তাদের এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার ফলে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকারকে বিগত পাঁচ বছর ধরে গোটা ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করল, সেই সরকার আগামী দিনে ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে কি পারবে না— সেই প্রশ্নের থেকেও বড়ো প্রশ্ন হল বিগত পাঁচ বছরে গোটা ভারতবর্ষের বুকে অর্থনৈতিক প্রশ্নের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা সেই সরকার রাখল, তার জঞ্জাল, আগামী ২৫ বছরেও ভারতবর্ষ থেকে দূর করতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সমন্বয় চেতনা। বিগত পাঁচ বছরে ভারতের সেই চিরন্তন সমন্বয়ী চেতনাকে ধ্বংস করাই ছিল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। পরমতসহিষ্ণুতার ঔদার্যে বলীয়ান যে হিন্দু সম্প্রদায়কে আন্তর্জাতিক দুনিয়া যুগ যুগ ধরে দেখেছে, সেই হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিচয় মুছে দিয়ে, তাকে রাজনৈতিক হিন্দুতে পরিণত করাই ছিল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস পরমত সহিষ্ণুতার ইতিহাসে সমৃদ্ধ। এই পরমতসহিষ্ণুতাই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পরমতসহিষ্ণুতার চিরন্তন ধারার উপরেই এক সমন্বয়ী চেতনা ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্বের দরবারে। ভারতবর্ষের সেই চির প্রবহমাণ সমন্বয়ী ধারাকে টুকরো টুকরো করাই ছিল বিগত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের প্রাণভোমরা আরএসএস-এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হল মুসলিম বিরোধিতা। সংঘের আদর্শগত ভিত্তির অন্যতম প্রধান নির্মাতা গোলওয়ালকার যে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, সেই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার কাজ করে গেছে। বাজপেয়ী সরকারের একক গরিষ্ঠতা না থাকার কারণে এই 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই সরকারকে যথেষ্ট রাখঢাক দেখাতে হয়েছিল।

মোদী সরকারের একক গরিষ্ঠতার কারণে তাঁদের সেই রাখঢাকের আশ্রয় নিতে হয়নি। আমাদের গোটা দেশের সামাজিক জীবনকে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের ভেতর দিয়ে কেন্দ্রে মোদী সরকার যেভাবে বিভাজিত করেছে, সেই বিভাজনের ফসল সংসদীয় গণতন্ত্রের নিরিখে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যতটা কুড়োবে, তার থেকে অনেক বেশি তারা সেই ফসল কুড়োবে সামাজিক জীবনের আঙ্গিকে।

সাধারণ মানুষ, যাঁরা হয়তো প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু অতীতে কোনোদিন তাঁদের সেই ধর্মীয় ধ্যানধারণাকে তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রসারিত বা প্রভাবিত করেননি, সেই অংশের মানুষকে, গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণায় রূপান্তরিত করবার ভেতর দিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা আরএসএস বা সংঘ পরিবারের সদস্যেরা বা তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক শক্তিকে ব্যবহার করে ছড়াতে শুরু করেছিল, তাকে গত ৫ বছর ধরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখার সুযোগ নিয়ে এক ভয়াবহ পর্যায়ে পর্যবসিত করতে পেরেছে।

নরেন্দ্র মোদী বা তাঁর মন্ত্রীসভার সতীর্থরা, কিংবা দলীয় সতীর্থরা, জাতীয় স্তরে হিন্দু-মুসলমানের নিরিখে যে সামাজিক বিভাজন এনেছেন, সেই বিভাজনকে আঞ্চলিক স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা নবীন পট্টনায়কের মতো তাঁদের স্বাভাবিক মাত্রা মিত্ররা, একটা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। বিগত পাঁচ বছরের মোদীর শাসনকালে দেশের যে প্রান্তগুলিতে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল, বা যে রাজ্যগুলিতে তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, সেইসব

জায়গায় এই সামাজিক বিভাজনের খেলা আরএসএস অত্যন্ত সফলভাবে খেলেছে। এই খেলা সেইসব জায়গায় তারা খেলেছে তাদের নিজের একক শক্তিতে। এই একক শক্তি বলতে কিন্তু গোটা সংঘ পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে।

তার বাইরে যে রাজ্যগুলিতে তারা ক্ষমতায় নেই, অথচ যে রাজ্যগুলিকে গত ৫ বছর ধরে নিজেদের সংগঠন এবং সংসদীয় শক্তি বাড়াবার লক্ষ্যে তারা পাখির চোখ করেছে, যেমন— পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা সেইসব রাজ্যগুলির আঞ্চলিক প্রশাসকেরা মোদী সরকারের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি— সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক বিভাজন, জাতপাতের নামে বিভাজন, ভাষা-ভিত্তিক বিভাজন ইত্যাদিকে একটা চরম জায়গায় পৌঁছে দিতে সবরকমভাবে সাহায্য করে গেছেন।

গত ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোরকে চুরি করা এবং গৃহস্থকে সজাগ থাকার প্রচলিত রসিকতাকে মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঈপ্সিত সামাজিক বিভাজনকে সবরকমভাবে প্রসারিত করবার সুযোগ করে দিয়েছেন। মমতার এই ভূমিকাটি নানাভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাহায্যে মানুষের সামনে উঠে এলেও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বিজেপি-র গোপন সহযোগী হিসেবে ভূমিকাটি কিন্তু সেভাবে আলোচিত হয়নি।

নবীনবাবু বাজপেয়ীর আমলে কিন্তু এনডিএ-র শরিক ছিলেন। বাজপেয়ীর তরী ডুবছে অনুভব করে তিনি এনডিএ ত্যাগ করেছিলেন। মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নবীনবাবু কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো অবস্থাতেই মোদীর বিরোধিতা করেননি। এমনকী তাঁর রাজ্যে বাজপেয়ী জমানার মতো কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, বেহরামপুর ইত্যাদি জেলাতে খ্রিস্টান আদিবাসীদের উপর সংঘ পরিবারের ভয়াবহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অত্যাচার সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে মোদী প্রশাসন বা সংঘ-বিজেপি-র বিরুদ্ধে একটি শব্দও নবীনবাবু উচ্চারণ করেননি।

যদিও বলতেই হয় নিজের একটা আপাত নিরপেক্ষতা দেখানোর তাগিদে এনডিএ-তে গিয়ে শামিল হননি নবীনবাবু। গোটা ওড়িশাজুড়ে সংঘ পরিবার এবং তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের ভেতর দিয়ে যে ভয়ংকর সামাজিক ভেদরেখাটিকে দগদগে ঘায়ের মতো ফুটিয়ে তুলেছে, তাকে রোখবার জন্য একটি পদক্ষেপও নবীনবাবু নেননি।

আরএসএস-এর তাত্ত্বিক ভিত্তির অন্যতম নির্মাতা গোলওয়ালকারের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ-এর প্রসারের লক্ষ্যে গোটা দেশজুড়ে যে সামাজিক প্রযুক্তি চালিয়ে চলেছে মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে, সেই সামাজিক প্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন পট্টনায়ক বা একদা তামিলনাড়ুতে অসীম ক্ষমতাশালী কুমারী জয়রাম জয়ললিতা যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে গেছেন, তাঁদেরকে সেই অনুঘটক হিসেবে অভিনয় করতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়াও কিন্তু গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বড়ো কার্যক্রমেরই অঙ্গ।

চিরন্তন ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক হিন্দু ভারতবর্ষে, সমন্বয়ী ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে একটি বড়ো কাজ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিগত পাঁচ বছরের শাসনকাল। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন প্রধানত তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে গুজরাটে গণহত্যা ঘটেছিল। এই গুজরাট গণহত্যা আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-কে গোটা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল।

গুজরাট গণহত্যা এবং তার পরবর্তী সময়ে যে সাম্প্রদায়িক, সামাজিক মেরুকরণ বিজেপি ঘটিয়েছিল, তার ফসল তারা ঘরে তুলেছিল ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভেতর দিয়ে। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ষোড়শ নির্বাচনের অব্যবহিত আগে উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্‌ফরনগরে বিজেপি এবং তার সঙ্গীসাথিদের অঙ্গুলিহেলনে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-কে অভাবনীয় ভালো ফল করতে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। বিজেপি-র এই যে দাঙ্গাকারী ভূমিকা সেই ভূমিকায় তাদের কিন্তু গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে আমরা তেমন একটা প্রকটভাবে দেখিনি।

ভয়াবহ দাঙ্গাকারী হিসেবে মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বিজেপি-কে বা তাদের মস্তিষ্ক আরএসএস-কে না দেখার অর্থ কিন্তু কোনোভাবেই এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, দাঙ্গার পথ থেকে আরএসএস বা তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি সরে এসেছে। বিজেপি ক্ষমতায় না থাকাকালীন দাঙ্গার ভিতর দিয়ে সামাজিক মেরুকরণের যে পরিবেশ তৈরি করে, সেই পরিবেশের ফসল তারা ভোটের রাজনীতিতে তোলে।

প্রশাসনে থাকা বিজেপি, দাঙ্গা সংগঠনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অতীতে মোদীর ভূমিকা, অভিমুখ থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে কিন্তু কৌশলগত অভিমুখ অনেকটাই বদল করেছে হিন্দুত্ববাদী শিবির। এই সময়কালে বিজেপি-র স্বাভাবিক মিত্র তৃণমূল কংগ্রেস বা তার সুপ্রিমো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৫টি দাঙ্গা হয়েছে।

অথচ বিজেপি ক্ষমতাসীন রয়েছে এমন রাজ্যগুলিতে

সেভাবে বড়ো কোনো দাঙ্গা হয়নি। বিজেপি-র এই কৌশলের উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্তরে দাঙ্গার ভেতর দিয়ে সামাজিক বিভাজন তারা যতটা করেছে, তার থেকে অনেক বেশি সামাজিক মেরুকরণ তারা করতে সম্ভবপর হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর গত পাঁচ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে লাভ জিহাদ, ঘর ওয়াপসি, গোরক্ষা ইত্যাদি চরম প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে। এই কার্যক্রমগুলির ভেতর দিয়ে মুসলমানদের সরাসরি হত্যা না করে, তাদের ভাতে মারার যে ভয়ংকর প্রবণতা নরেন্দ্র মোদী সরকার গত ৫ বছর ধরে ভারতবর্ষে দেখিয়েছে, তার ডিভিডেন্ট তুলবার সবরকমের প্রচেষ্টা বিজেপি সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে করেছে।

অপরপক্ষে বিজেপি সরাসরি দাঙ্গা না করলেও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য, যেটিকে বিজেপি নিজেদের যথেষ্ট সম্ভাবনাময় রাজ্য বলে মনে করে, যে রাজ্যকে বিজেপি তাদের সংসদীয় রাজনীতির আগ্রাসনের বড়ো টার্গেট বলে মনে করে, সেখানে তাদের স্বাভাবিক মিত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থাকার ফলে ছোটো, বড়ো ধারাবাহিক দাঙ্গার ভেতর দিয়ে যে ভয়াবহ সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছে, সেই বিভাজনকে তীব্র করে দিতে কেন্দ্রে মোদী সরকার চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

লোকসভা নির্বাচনের ঠিক অব্যবহিত আগে পুলওয়ামার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেমের নামে উগ্রতা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এ রাজ্যে যে ভয়াবহ সামাজিক বিভাজন বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরের পরিপূরক হিসেবে তৈরি করেছে, সেই বিভাজনকে সংগঠিত করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে গত ৫ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদী সরকারের ভূমিকাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বস্তুত গত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর যখন মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়, সেই সময় থেকেই দেশের পূর্বাঞ্চলকে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর মুক্তাঞ্চল হিসেবে বেছে নিয়েছিল আরএসএস এবং তার সঙ্গীসাথিরা।

সেই বেছে নেওয়ার ছাপ থেকেই বিজেপি সেই লক্ষ্যে স্থির থেকে গত ৫ বছর ধরে কাজ করে গেছে। তাদের সেই কাজের ধারাবাহিকতা আর তথাকথিত সাফল্য তারা পেয়েছে ত্রিপুরা, আসামে। সেই তথাকথিত সাফল্যের ফসল তুলতে তারা পশ্চিমবঙ্গে এখন ভয়ানকভাবে তৎপর। মোদী সরকারের গত পাঁচ বছরের এই সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের একটা ছাপ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনেও খানিকটা প্রতিক্রিয়া ফেলবার চেষ্টা করেছিল। যদিও বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাদের দেশের অভ্যন্তর এবং আন্তর্জাতিক মহল থেকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে তীব্র করবার সমস্ত রকমের প্রবণতাকে জোরের সঙ্গে রুখে দিয়েছেন।

মোদী সরকার তাদের গত পাঁচ বছরের শাসনকালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে আর এক ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়া চালিয়েছে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের সেই বিভাজন প্রক্রিয়া গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার কোনো কসুর নরেন্দ্র মোদী সরকার করেনি। সেখানে প্রথমে মেহবুবা মুফতির দলের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সরকার তৈরি করে বিজেপি। পরবর্তীকালে সেই সরকারকে ফেলে দিয়ে রাজ্যপালের শাসনের আড়ালে নিজেদের শাসন কায়েম করে নরেন্দ্র মোদী কার্যত কাশ্মীর উপত্যকায় এক ভয়াবহ সামাজিক সংকটকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলবার সবরকমের প্ররোচনা দিয়েছেন।

বস্তুত নরেন্দ্র মোদীর গত পাঁচ বছরের শাসনকালে কাশ্মীর উপত্যকায় সেনাবাহিনী যেভাবে সেখানকার সাধারণ, নিরীহ, নিরপরাধ নাগরিকদের উপরে পেলেট গান-সহ নানা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের দাঁড়া দ্বারা আঘাত করেছে তা কার্যত কাশ্মীর এবং কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে গোটা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে বলপূর্বক বিভাজিত করবার ক্ষেত্রে একটি বড়ো রকমের হৃদয়বিদারক ঘটনা হিসেবেই ভবিষ্যতে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ১৯১৯

সোমশঙ্কর সিংহ

দূরভাষে গলা ভেসে এল: 'অমৃতসর থেকে বলছি স্যার। আমি আজমল। জালিয়ানওয়ালাবাগে 'শহিদি কুঁয়া'-র সামনে দাঁড়িয়ে আছি, স্যার, বউ ছেলেকে নিয়ে।' অবাক হয়ে কিছু বলার আগেই,— ওপারের আবেগের ঢেউ আবার আছড়ে পড়ল: 'আজ ১৩ এপ্রিল। শতবর্ষ। আপনিই তো শোনাতেন। আমি এখন আমার ছেলেকে শোনাচ্ছি স্যার।' গলা ধরে এল আজমলের।... মুহূর্তের মধ্যেই জালিয়ানওয়ালাবাগ এক অত্যাশ্চর্য, পরম্পরা হয়ে জাদু-বাস্তবতায় দুলতে লাগল আমার স্মৃতিতে।...

...সেটা ১৯৪৫ সালের শেষের দিক। সমাপ্তি ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। এই প্রতিবেদকের বয়স তখন আটের কাছাকাছি। ক্লাস ফাইভে পড়ি আসামের তেজপুর বেঙ্গলি বয়েজ স্কুলে। নতুন এক মাস্টারমশাই এলেন। চেহারায় ছোটোখাটো। স্নেহে নরম, প্রয়োজনবোধে শাসনে কিন্তু বেশ দৃঢ়চেতা। সস্তা জনপ্রিয়তার ধার ধারতেন না। অথচ মাত্র ২/৩ মাসের মধ্যেই ছাত্রমহলে তিনি কিন্তু প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তিনি দুটি কাহিনি শোনাতেন। আবেগময় স্টাইলে। এক, সেই পিতৃভক্ত বালক-বিস্ময় ক্যাসাবিয়াঙ্কার স্বেচ্ছাহুতির ঘটনা। মনে আছে? সেই, 'দ্য, বয় স্টুড্ অন্ দ্য বার্নিং ডেক্' কবিতাটি?... দুই, জালিয়ানওয়ালাবাগে পৈশাচিক গণহত্যার হৃদয় জ্বালিয়ে দেওয়া কাহিনি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড্ আব্রাহাম ডায়ারের নির্দেশে ৫০ জন সৈন্য (তারা কিন্তু ভারতীয় ছিল!) ১০ মিনিট ধরে একটানা ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে নিরস্ত্র হাজার খানেক ভারতবাসীকে, বিনা প্ররোচনায় মেরে ফেলে। সেই ঘটনা। বলতে বলতে বিভূতিবাবুর ('পথের পাঁচালি'-র লেখক নন কিন্তু) চোখে জল আসত। আমাদেরও। সব শব্দ হয়তো পুরোপুরি বুঝতাম না। কিন্তু সেই ছোট্ট বয়সের মানসিকতায় ভাবতাম, দুষ্টু ইংরেজকে আমরা তাড়িয়েই ছাড়ব। আমার রাগের পরিমাণটুকু আবার ছিল কিছু বেশি। একে স্বাধীনতাসংগ্রামী মা-বাবার সন্তান। তার আবার ওই ১৯৪৫ সালেরই মাঝামাঝি সময়ে একটি ঘটনায় এই প্রায়-বালকটিকে এক গোরাসৈন্যের বুটের লাথি খেতে হয়েছিল। তাই, সেই অল্প বয়সেই কেমন যেন এক জ্বালা আমায় উত্তেজিত করে তুলত। বিভূতিবাবু বলতেন, 'তোমরা ভেবো না যে শুধুমাত্র ওই মৃত বা মৃতপ্রায় মানুষগুলির শরীর থেকে রক্ত ঝরেছিল। সমস্ত জাতির হৃদয়ে ঘটেছিল ইন্টারনাল হেমারেজ বা ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ। শোকে দুঃখে ক্রোধে ঘৃণায়।' এতবার বলতেন যে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল কথাগুলি। আজ এই ২০১৯-এ বসে সেই মর্মবিদারী ঘটনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হাতে এল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর প্রাসঙ্গিক একটি ছোট্ট অথচ প্রজ্ঞাদীপ্ত ইংরেজি নিবন্ধ। 'দ্য স্ক্রোল' নামে একটি ওয়েব পোর্টাল বা ওয়েব ম্যাগাজিন থেকে লেখাটি পাওয়া গেল। শিরোনাম 'One hundred years of the Jallianwala Bagh Massacre : What Tagore wrote in 1919 resounds today' এই সুভদ্র, জ্ঞানী এবং সুলেখক প্রাক্তন রাজ্যপাল সম্পর্কে নিশ্চয়ই নতুন করে পরিচিতি দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কী আশ্চর্য! যুগান্তরের ওপার থেকে ভেসে আসা মাস্টারমশাইয়ের সেই হৃদয়সংবেদী মন্তব্যটিরই যেন এক ধ্রুপদি অনুরণন! শোনানোর লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না:

'If the name of any physical spot, a precinct, has become a symbol of something that changed history, it is Jallianwala. Golgotha two millennia ago, Auschwitz seventy years ago, Sharpeville, South Africa, in 1960, Tiananmen Square, China, 1989, are others in the same league of history-changers.

One hundred years are a long time in political history. Long enough for any event to be plastered over by subsequent happenings, later occurrences. Long enough for the event to tum from the vivid colours of felt experience into the sepia of fading memory. But not so, Jallianwala, Amritsar. On April 13, 1919, Amritsar became India. An India outraged, bloodied, but made amazingly and upprecedentedly resolute. Jallianwala Bagh was no

site of an event or occurrence but of a trauma. A trauma so deep as to have altered the very composition of India's political psyche, the chemistry of Indians as a people.' ... অনুবাদ এই ভাষা ও বাক্যবিন্যাসকে সসম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দেয়। বলে, তুমিই তো স্বয়ংপ্রকাশ পাঠকের দরবারে।...

... কী ঘটেছিল ১৯১৯-এর সেই ১৩ এপ্রিলের বৈশাখী মেলার দিনে? ইতিহাসে পড়া। তবু মনে করা যাক। সেই মর্মন্তুদ ঘটনার সারাৎসারটুকু। অমৃতসর শহরে সাঠেওয়ালা বাজারের কাছে কিছু বাড়ি, সামান্য গাছ এবং নিচু পাঁচিলে ঘেরা একটি ছোট্ট মাঠ-সদৃশ জায়গা। ঢোকা ও বেরোনোর জন্য সরু গোটা দু-তিনেক ফাঁক। একপাশে একটি কুয়ো। ওই স্বল্প পরিসরেই প্রায় কুড়ি হাজার নিরস্ত্র মানুষ সমবেত হয়েছিলেন একটি সভায়। উদ্দেশ্য? পরাধীন পাঞ্জাববাসীর ন্যূনতম প্রতিবাদকেও প্রায় বিনা বিচারে টুঁটি টিপে মারার জিঘাংসা নিয়ে, তদানীন্তন ইংরেজ শাসকদের তৈরি করা, কুখ্যাত দমনমূলক কালা-কানুন 'রাউলাট আইন'-এর বিরোধিতা করা এবং বিগত কয়েক দিনে নিরীহ ভারতবাসীর উপর ঘটে যাওয়া ব্রিটিশ রাজের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। অবশ্য কয়েক জন ইংরেজও নিহত হয়েছিলেন উত্তেজিত জনতার হাতে। তবুও, শাসকের জারি করা জরুরি অবস্থা, সামরিক আইন এবং নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই সমাবেশ। পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্নর তখন স্যার মাইকেল ওডায়ার এবং ভারতবর্ষের ভাইসরয় বা প্রধান রাজপ্রতিনিধি ছিলেন জন নেপিয়ার চেমস্‌ফোর্ড। পরামর্শদাতাদের সঙ্গে যুক্তি করে এঁরা সামরিক শাসক হিসাবে আমদানি করেন ইংরেজ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে। এই অফিসার স্বভাবে ছিলেন বেজায় ক্রূর। অতএব, দমননীতিতে শাসকের মনপসন্দ। পদানত নেটিভদের শায়েস্তা করার জন্য তিনি যা করেছিলেন তাতে সারা বিশ্ব, এমনকী উদারমনা কিছু ইংরেজ বুদ্ধিজীবীও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। গোলাগুলি ভর্তি বন্দুক এবং ৫০ জন গোর্খা ও শিখ সৈন্য বেরুবার পথ আটকে বিনা প্ররোচনায় ১০ মিনিট ধরে চালাল নিধনলীলা। ১৬৫০ রাউন্ড গুলি; সরকারি মতে মৃত ৩৭৯, আহত ১২০০। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটি যথাক্রমে হাজার খানেক এবং ১৬০০। মৃতদেহের মধ্যে ভেদ ছিল না হিন্দু-মুসলিম-শিখের। প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেই কুয়োয় যাঁরা ঝাঁপ দিয়েছিলেন শ্বাসরোধের কবলে পড়েন তাঁরা।

অথচ, তিলমাত্র অনুশোচনা ছিল না এই নরমেধযজ্ঞের হোতা ডায়ারের। পরবর্তীতে তাঁর এই শয়তানসুলভ কুকর্মের তদন্ত করার জন্য ব্রিটেনে যে কমিটি (লোকদেখানো) গঠিত হয়েছিল সেখানে ডায়ারের বক্তব্য ছিল একেবারে একবগ্‌গা: শুধুমাত্র সেই সভা বানচাল করা এবং ভিড় হটানো নয়, সারা ভারতকে সন্ত্রস্ত করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গুলি শেষ না হয়ে গেলে তিনি আরো হত্যার নির্দেশ দিতেন।... আগেই উল্লেখ করেছি যে গোপালকৃষ্ণ গান্ধী তাঁর সাম্প্রতিক নিবন্ধটিতে এই নারকীয় ঘটনাকে কিছু ঐতিহাসিক 'ম্যাসাকার'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সঠিকভাবেই।

...এও এক ঐতিহাসিক সত্য যে এহেন ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের অভিঘাতে সারা ভারত হয়ে পড়েছিল রুদ্ধবাক্, শোকস্তব্ধ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ব্রিটিশ সেন্সরশিপ এই খবর চেপে রাখতে বাধ্য করেছিল বেশ কয়েক দিন। সমালোচনার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন মান্যগণ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ। এই শোকাবহ ঘটনায় সারা ভারতজুড়ে তখন তিন সমুদ্র হাহাকার আর এক হিমালয় পাথরচাপা দুঃসহ যন্ত্রণা। সেই প্রতিবাদহীনতার তমসাচ্ছন্নতার মধ্যে জ্বলে উঠল এক নির্ভীক দীপশিখা। সমগ্র জাতির হয়ে এক প্রতিবাদলিপি: 'When badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, I for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings.'

কার? সকলেরই জানা। স্বয়ং বিশ্বকবি ও দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (তখন বয়স ৫৯)। ইংলন্ডেশ্বরের দেওয়া (১৯১৫ সালে) 'নাইটহুড' বা 'স্যার' খেতাব তিনি ফিরিয়ে দিলেন ৩১ মে তারিখে। ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে লেখা সে এক অনন্যসাধারণ চিঠি। নিপীড়িত জাতিসত্তার আত্মমর্যাদা-উদ্ভাসিত শব্দচয়নে দৃপ্ত। ৩ জুনের 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যা জনসমক্ষে এল:

...এই নিবন্ধের পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই ভাবছেন, দেশের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ বিপুল সমর্থন জানিয়েছিলেন কবির এই সিদ্ধান্তকে। তাই তো!... না, মোটেই তেমনভাবে নয়।

হায়! ভারতেই যা হয়তো সম্ভব!

তদানীন্তন দেশবাসী এবং ব্রিটিশ-শাসকদের বিরুদ্ধে নরমে-গরমে মেশানো ভাষণ ও কর্মসূচিতে ব্যস্ত জাতীয় নেতৃত্ব কেমনভাবে নিয়েছিলেন একক-প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড-প্রত্যাখ্যানকে, —তা বেশ কৌতূহলপ্রদ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমালোচনাযোগ্যও বটে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কিছু সদস্যের ধারণায়, কোনো ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরে, সংবাদপত্রে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের খবরটি প্রকাশিত হবার আগেই, পাঞ্জাব থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এই শোচনীয় ঘটনার বৃত্তান্ত। কবি তখন খুব একটা সুস্থ ছিলেন না। তার ওপর দেশজোড়া প্রতিবাদহীন নীরবতা। বিচলিত রবীন্দ্র, দীনবন্ধু

(চার্লস) এন্ড্রুজের মাধ্যমে গান্ধীজির কাছে প্রস্তাব পাঠালেন এই মর্মে যে তাঁকে নিয়ে অমৃতসরে গিয়ে আইন অমান্য এবং গ্রেফতার বরণ করে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাবেন। জবাব নেতিবাচক। সরকারকে সেইসময় 'বিব্রত করার' ব্যাপারে মোহনদাস ইচ্ছুক নন। অগত্যা কবি, 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা সেরে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে নিজে গিয়ে একটি প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করার অনুরোধ রাখলেন। সেখানেও পেলেন না তেমন সাড়া।

একটু পূর্বকথা অবশ্য রয়েছে। গান্ধীজির আহ্বানে সত্যাগ্রহ প্রথমে শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে একথা তো সর্বজনজ্ঞাত যে জালিয়ানওয়ালার আগে ৯ ও ১০ এপ্রিল অমৃতসরে জনতার সহিংস বিক্ষোভে জনাকয় পুলিশ ও ৫ জন ইউরোপীয়ের প্রাণহানি, অহিংস সত্যাগ্রহ থেকে ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদী জনগণের কিয়াকর্ম কিছুটা হিংসার দিকে চলে যাওয়া ইত্যাদি ঘটেছিল। শাসকদের প্ররোচনা অবশ্য যথেষ্টই ছিল। পাঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতা সৈফুদ্দিন কিচ্‌লু ও ড. সত্যপালকে গ্রেপ্তার এবং বিক্ষোভ দমনের নামে ২০-২৫ জনকে গুলি করে হত্যা, জনমানসকে করে তুলেছিল বিক্ষুব্ধ ও আক্রমণাত্মক। ফলে কুখ্যাত রাউলাট আইনের বিপক্ষে গান্ধীজি ৬ এপ্রিল থেকে যে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তাকে 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' বলে স্বীকার করে, ১৮ এপ্রিলে তা প্রত্যাহার করে নিলেন। ব্রিটিশ শাসকের বুট আর বন্দুকের নীচে তখন পাঞ্জাব এবং অবশিষ্ট ভারত। এই প্রেক্ষিতেই ৩১ মে, একক প্রতিবাদ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' (নাইটহুড) উপাধি ফিরিয়ে দেওয়া।

প্রতিক্রিয়া? শ্রীযুক্ত এম. কে. গান্ধীর মতে 'সময়োপযোগী নয়'। শব্দবন্ধগুলি ছিল, 'burning letter...premature'। বলে রাখা ভালো, একই ঘটনার সূত্রে, দক্ষিণ আফ্রিকা-ফেরত এই নেতাই কিন্তু তাঁর কাইজার-ই হিন্দু উপাধি ত্যাগ করেন এক বছর পরে ১৯২০-র আগস্টে। এক বঙ্গজ সন্তান পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে সর্বদাই খোঁচা দেবার জন্য খ্যাতিমান! তাঁর মতে এই 'নাইটহুড' ত্যাগে দেশের কোনো সুবিধা হবে না। বিপিন পালের মন্তব্য উৎসাহজনক তো ছিলই না। বিদেশি শাসকের বশংবদ দৈনিক 'দ্য ইংলিশম্যান' লেখে, 'তিনি "স্যার" ছাড়লেন বা বাবু থাকলেন; তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কী এল গেল।' অবশ্য সমর্থনও কিঞ্চিৎ ঘটেছিল। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং মল্লবীর গোবর গোহ (খোদ ব্রিটেনে দাঁড়িয়ে) অভিনন্দন জানান। কিছুদিন পর একটি বিখ্যাত কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানান এই ঘটনার উল্লেখ করে: 'রুদ্ধকণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে/নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে.../তুচ্ছ করি রাজরোষ, উপরাজে দিল যে ধিক্কার/নমস্কার, করি নমস্কার।' ... কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একটি চিঠিতে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে।' অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে, 'Rabindranath has done a rather risky thing.' সেই মৃত্যুনীল জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে কোনোমতে প্রাণে বেঁচে ফিরেছিলেন তরুণ পাঞ্জাবি কবি নানক সিংহ। অমন নির্বিচার হত্যালীলা। আর্ত আহতদের জল পর্যন্ত দিতে দেওয়া হয়নি। ছিল না আলো। পরিজনদের মৃতদেহ বা আহতকে আঁকড়ে বসে থাকতে হয়েছিল সারারাত। চিকিৎসা? রিবেল ও বিদ্রোহী নেটিভদের আবার ওসব লাগে নাকি! পান থেকে চুন খসলেই বন্দুকের গুলি। কোনো কোনো গলিতে বা রাস্তায় সৈন্যদের নির্দেশে হামাগুড়ি দিয়ে পথ পেরুতে হত। এসব সামনাসামনি দেখার ট্রমায় পাগল হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু কবি তো! সে এক আলাদা সৃজনী শক্তি। পাথরচাপা বেদনার উপলখণ্ডগুলি সরিয়ে সরিয়ে প্রকাশিত হল রক্তলেখার কাব্যঝরনা— 'খুনি বৈশাখী' (১৯২০) এবং 'জখ্‌মি দিল্' (১৯২৩)। প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই নিষিদ্ধ এবং সব কপি বাজেয়াপ্ত করে বিদেশি শাসক। তবে হ্যাঁ, ডিপ্লোম্যাসিতে ব্রিটিশরাজ ক্ষেত্রবিশেষে পটু। তাই জল না ঘুলিয়ে, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড প্রত্যর্পণের ব্যাপারটিকে, সম্রাটের কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে, সামাল দেয়। আমলাতন্ত্রে যেমন হয়, ম্যাটার ইজ্ রিসিভিং অ্যাটেনশন্ গোছের একটি জবাব কবিকে দেওয়া হয়।

এবার একটু টোকা মেরে দেখা যাক সমকালীন ইংরেজদের মনোজগৎকে। ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের তো কথাই নেই। 'চুলোয় যাক নেটিভ পোয়েট, তা তিনি যত বড়ো "নোবেল লরিয়েট্" হোন না কেন',— তাদের ৯০ শতাংশের এই ছিল ধারণা। ডায়ারকে তারা 'Saviour of the Punjab বা পাঞ্জাবের রক্ষাকর্তা' হিসেবেই দেখেছিল এবং ব্রিটিশ মহিলারা ঢালাও তাতে চাঁদা তুলে তা ওই নরঘাতী ডায়ারকে উপহার দিতেও সংকোচবোধ করেনি। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে ইংল্যান্ডেও সেখানকার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন নাগরিকেরা 'দ্য মর্নিং পোস্ট' পত্রিকা আয়োজিত 'ডায়ার-পৃষ্ঠপোষকতা-তহবিলে', দান করেছিল ২৬ হাজার পাউণ্ডেরও বেশি। তাদের মধ্যে ছিলেন নোবেলজয়ী সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপ্‌লিং (এই মহাশয় অবশ্য প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন সম্পর্কিত কোনো ইতিবাচক চিন্তাকেই পাত্তা দিতেন না) এবং পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ওডায়ার (যাঁকে পরে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লন্ডনে এক সভায় গুলি করে হত্যা করেন বিপ্লবী উধম সিং)।

আর, খোদ ব্রিটিশ কর্তাদের মতিগতি কী ছিল? একথা

অনস্বীকার্য যে উল্লিখিত 'ছোটো ইংরেজদের' তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম হলেও মুক্তচিন্তার অধিকারী কিছু 'বড়ো ইংরেজ'-ও (রবীন্দ্রনাথের কথায়) ব্রিটেনে বা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের এবং বিশ্ব বিবেকের সমালোচনার চাপে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ম্যাসাকার' নিয়ে 'তদন্ত' (শব্দটা মনে রাখবেন) করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। তাও সোয়া এক বছর পরে। জেনে রাখা ভালো যে এই নারকীয় কুকর্মটি সেরে, ৫৬ বছর বয়সে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 'জল্লাদ' ডায়ার (শুভবুদ্ধিসম্পন্নরা তাঁকে Butcher; of Amritsar আখ্যা দেন) মে, ১৯২০-তে ব্রিটেনে যান ফিরে। ৮ জুলাই ১৯২০-তে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সে (আমাদের দেশে যেটা লোকসভা) বিষয়টি নিয়ে হয় আলোচনা। তদানীন্তন যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ডায়ারের কাজকে অতীব নিন্দা করে বলেন, 'extraordinary event, a monstrous (দানবীয়) event, an event which stands in singular and sinister isolation...' ভারতসচিব মন্টেগু ছিলেন অপেক্ষাকৃত সুভদ্র, বিবেচক এবং ভারতবাসীর প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল। তাঁর বক্তব্যে এই সংশয় ছিল যে এই ঘটনা দুই দেশের সম্পর্ককে খারাপ করতে পারে। ব্রিটেনের বিরোধীপক্ষ ও উদারপন্থীরা ডায়ারের সমালোচনা করেন। একপক্ষকাল পরে উচ্চতর কক্ষে অর্থাৎ হাউস অব লর্ডসে কিন্তু ডায়ারের কাজই বেশি তোল্লা পায়। তদন্তের জন্য গঠিত হয় দুইটি কমিটি,— একটি লন্ডনে এবং অন্যটি ভারতে। স্কটল্যান্ডের বিচারক লর্ড উইলিয়াম হান্টার দেশীয় কমিটির প্রধান ছিলেন বলে এটি পরিচিত হয় হান্টার কমিটি নামে। উদ্দেশ্য : 'ডিসঅর্ডার্স এনকোয়ারি কমিটি'। লন্ডনে তদন্ত কমিটির সামনে ডায়ারের সগর্ব ঘোষণা: 'horrible, dirty duty'। এ সব কিছুর পরে দেখা গেল নীটফল শূন্য। যত গর্জে বর্ষে না তত। ডায়ারকে কোনো শাস্তি না দিয়ে অবসরে পাঠানো হল এবং তাঁর যাবতীয় প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হল (যদিও তাঁর চাকরির মেয়াদ ছিল আর মাত্র বছর দেড়েক। অথচ অমৃতসরে পাঁচজন 'স্বজাতি'-র মৃত্যুর বদলা নেবার জন্য, বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে, ৮৫২ জনকে অভিযুক্ত করে সরকার। তাদের ১০৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ২৬৪ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ২০৯ জনকে অন্যান্য সাজা দেওয়া হয়। এই হল সাম্রাজ্যগন্ধী ব্রিটিশ জুরিসপ্রুডেন্স (বিচার ব্যবস্থা)-এর একটি দিক। অনুশোচনা? তাও কি আছে? ১৯৯৭ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ভারত সফরে এসে, জালিয়ানওয়ালার শহিদ স্মারকের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দুঃখ প্রকাশই করেছিলেন। মার্জনাভিক্ষাটুকু আজও চেয়ে ওঠা হয়নি। বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে-ও একই পথ ধরেছেন। আমরা কি এখনও চুপ করে থাকব?

তা বলে কি জালিয়ানওয়ালাবাগ-সেন্টিমেন্টকে ভারতবাসীর মন থেকে ব্রিটিশশক্তি মুছে দিতে পেরেছে? 'দাবিয়ে রাখতে পেরেছে' তার জাতিসত্তার জাগরণকে? একদমই না। বিন্দুমাত্র না। বরং ওই বধ্যভূমি-ই একটি মুমুক্ষু জাতির প্রেরণাভূমি হয়ে উঠেছে। সময় যত এগিয়েছে, ভারতের মুক্তিসংগ্রাম যত জোরালো হয়েছে; মৃত্যু-পরিকীর্ণ তমসা থেকে দিশারি ধ্রুবতারার মতোই জালিয়ানওয়ালাবাগের উত্তরণ ঘটেছে জাতীয় জীবনে। স্থায়ী আসন নিয়েছে রাজনীতিতে, ইতিহাসে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। কবিতা, গাথা, গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্রে। ভারতের প্রতিটি ভাষায়। এমনকী ভারতকথা-নির্ভর ইংরেজি আখ্যানেও। প্রেরণা হয়ে। প্রণোদনা হয়ে। সলমন রুশদির 'মিড-নাইট্স চিলড্রেন', চমন নাহালের 'দ্য ক্রাউন অ্যান্ড দ্য লয়েনক্লেথ', মার্কিন লেখক স্ট্যানলি ওল্পার্ট-এর 'ম্যাসাকার অ্যাট জালিয়ানওয়ালা বাগ', কিশোয়ার দেশাইয়ের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ১৯১৯/দ্য রিয়াল স্টোরি', কিম্ এ ওয়াগনার-এর 'জালিয়ানওয়ালা বাগ/অ্যান এম্পায়ার অব ফিয়ার অ্যান্ড দ্য মেকিং অব দি অমৃতসর ম্যাসাকার', অ্যাটেন্বরোর চলচ্চিত্র 'গান্ধী', অনিতা আনন্দের (মূলত উধম সিংকে নিয়ে) 'দ্য পেশেন্ট্ অ্যাসাসিন/আ ট্রু-টেল অব্ ম্যাসাকার, রিভেঞ্জ অ্যান্ড দ্য রাজ' ইত্যাদি তো বহুলপঠিত। খাজা আহম্মদ আব্বাসের ফিল্ম 'ইনকিলাব', ভীষ্ম সাহনির নাটক 'রং দে বাসন্তী চোলা', কৃষণ চন্দরের আখ্যায়িকা 'অমৃতসর, আজাদি কি পহেলে', পাঞ্জাবের কবি জ্ঞানী হিরা সিং গর্দের কবিতা কিংবা বিখ্যাত গল্পকার সাদাত হোসেন মান্টোর '১৯১৯ সালের একটি ঘটনা'-র কথা আজও রক্তক্ষরণ ঘটায় প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয় ও মননে। দশ মিনিটের এক কাণ্ডজ্ঞানহীন হৃদয়বোধ-বিরহিত নিধনপর্ব, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ব্যালাড হয়ে উঠেছে। ইতিহাস হয়ে এটাই শিখিয়েছে যে ত্রাস-স্তব্ধ হয়ে মূক থাকা নয়, উদ্যত মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদের পথেই ঘটাতে হয় শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে অভিযাত্রা।

আবার একথাও অনেক ইতিহাসবিদ মানেন যে ব্রিটিশ শাসকদের স্মৃতিতে ছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)-র সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৭ সালের মহাদ্রোহকালের দুঃস্বপ্ন। ছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অস্বস্তি। দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেলেও হতোদ্যম হয়নি বাংলার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী এবং সদ্য-ঘটা (১৯১৫) বাঘাযতীনের ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ তারই অংশ। তাই 'অমৃতসর ম্যাসাকার'-এর ভয়াবহ সন্ত্রাসী নির্যাতন ঘটিয়ে, ডায়ার-মাইকেল-চেমস্ফোর্ড ত্রয়ী, বস্তুতপক্ষে রাজার সামনের বোড়ে সরিয়ে নেওয়ার আত্মঘাতী

চাল-ই দিয়ে ফেলেছিলেন। ভারত হাতছাড়া হবার ব্রিটিশ-কফিনে অবশ্য প্রথম পেরেকটি ঠুকেছিলেন সিডনি রাউলাট, একথা জোর গলাতেই বলা চলে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের হাওয়ামোরগ তার অভিমুখ পালটায় জালিয়ানওয়ালার ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কাতেই। আমাদের তদানীন্তন জাতীয় নেতৃত্বের সংখ্যাগুরু অংশের 'আবেদন-নিবেদন-সরকারকে বিব্রত না করা' জাতীয় প্যানপ্যানানির অবসান ঘটিয়ে 'স্বাধিকার ও পূর্ণ স্বরাজের' দাবি এবং বিপ্লববাদ, বামাদর্শ, শ্রমিক শ্রেণির অভ্যুদয়, সাধ্যানুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে জোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের পাতা ওলটালেই মিলবে একরাশ প্রমাণ। ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিছুটা ধন্যবাদ তাই বিদেহী ডায়ারেরও প্রাপ্য।

এবার আসি জালিয়ানওয়ালার স্মৃতি সংরক্ষণের প্রসঙ্গে। সেখানেও সিংহভাগ অবদান এক বাঙালির। কে তিনি? হুগলি জেলার দশঘরার ভূমিপুত্র ডা. ষষ্ঠীচরণ মুখার্জি। চিকিৎসক হিসেবে এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নির্দেশে অমৃতসরে আসেন ১৯১০-এ। ১৯১৯-এর ১৩ এপ্রিল ছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের এই সভায়। মঞ্চের নীচে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে যান। ইংরেজরা তাদের পাপকর্মের প্রমাণ-লোপ করার জন্য ওই বাগে কাপড়ের বাজার বসানোর উদ্যোগ নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ধরতে পেরে, ডা. মুখার্জি, কংগ্রেসের সম্মতিতে দেশবাসীর কাছ থেকে চাঁদা তুলে (গান্ধীজিরও সায় ছিল) সাড়ে ছয় একর জমিটি কিনে নেন ১৯২০-তে। তাঁর অভিলাষ, শহিদদের উদ্দেশে সেখানে স্মরণীয় কিছু করা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১লা মে ১৯৫১-তে গঠিত হয় 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। চেয়ারম্যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রথম সম্পাদক করা হয় ডা. মুখার্জিকেই। প্রখ্যাত আমেরিকান স্থপতি বেঞ্জামিন পোলক করেন 'শহিদস্মারক'-এর নকশা। ১৯৬১ সালের ১৩ এপ্রিলে, নেহরুজি এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে সে-সময়ের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে হয় উদ্‌বোধন।

আজকের ওই শহিদস্মারকের সামনে দাঁড়ালেও মনে ঝংকার দেয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ কণ্ঠে: 'জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু/সে পথে আমাকে পাবে/জালালাবাদের পথ ধরে ভাই ধর্মতলার মোড়ে/দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে/ক্ষুব্ধ এ-দেশের রক্তের অক্ষরে... রক্তের অক্ষরে।' বধ্যভূমি সত্যিই এখনও সব প্রজন্মের কাছে এক চিরন্তন প্রেরণাভূমি।

ছোট্ট একটি খবর না জানিয়ে এ লেখার শেষ হতে পারে না। ওই স্মারকভূমিতে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' ('লুমিয়ের') ব্যবস্থায় একটি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। যেমন দিল্লির লালকেল্লা, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি জায়গায় রয়েছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে ইতিহাস যেন সজীবতা পায় দর্শকদের কাছে। কয়েক জন পরিজনের মুখে খবর পেলাম, গত ৫ বছরে বেশ কয়েক বার চেষ্টা করেও তাঁরা ওই লুমিয়ের দেখতে পাননি। ২০১৪ সালের কোনো এক সময় থেকে ওই ব্যবস্থা বন্ধ। লালকেল্লাতেও তা সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কয়েকটি দপ্তরই ব্যাপারটি দেখাশোনা করে। কেন বন্ধ? তাঁরাই তা জানেন। রাজনীতির রসায়নে আজকাল আবার ঐতিহ্যময় ঘটনারও রং বদলায় কিনা। যাই হোক, এই শতবর্ষেও কি তা আবার চালু করা যায় না? বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য জালিয়ানওয়ালার শতবর্ষ স্মরণে একটি ১০০ টাকার স্মারকমুদ্রা প্রকাশ করেছেন। সাধারণত এইসব স্মারকমুদ্রা সাধারণ মানুষ খুব কমই দেখতে পায়। কাজেই সত্যিকারের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কি এতেই শেষ হয়ে গেল!... 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা/এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?...'

...পরম্পরার কি শেষ আছে?

...আট দশকের জীবনে কতশত বারই তো স্লোগানে গলা মেলালাম: 'শহিদ স্মরণে আপন মরণে রক্তঋণ শোধ কর'। জানি না আজ সেই মাস্টারমশাই বিভূতিবাবু কোথায় আছেন। শুনলে পরে সস্নেহে মৃদু হেসে হয়তো বলতেন, 'ওরে, রক্তঋণ-শোধ কি গিমিকে হয়! ভাষণে নয়, হৃদয়ে স্বচ্ছতা থাকলে তবেই হয়, ... তবেই হয়!'

অন্য রকম পূর্ব এশিয়া

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

কাম্বোডিয়া/লাওস
ফনোম পেন

'ওই যে দূরে পাহাড়গুলো দেখছেন, সেখানেই আমাকে ডিউটি দিয়েছিল। আমার বয়েস তখন কতই-বা হবে, এই বারো-তেরো। হাতে একটা এ.কে. ৪৭ ধরিয়ে দিয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হত। খাবার নেই। কোথাও যাবার অনুমতিও নেই। আফিং আর তামাক পাতা মিশিয়ে একটা করে প্যাকেট ধরিয়ে দিত। তাই চিবিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি। আমার মতো আরো ছেলে ছিল। সবার উপর নজর রাখত। একবার আমার চেনা একটা ছেলে খিদের জ্বালায় পালাবার চেষ্টা করেছিল কিছু খাবার জোগাড়ের জন্য, দাঁড়িয়ে দেখলাম ওকে পিছন থেকে গুলি করে মারল।'

কথা হচ্ছিল আমার সহকর্মী ট্যান খিয়াক-এর সঙ্গে। কাম্বোডিয়ার কিলিং ফিল্ডস-এ দাঁড়িয়ে। এখানেই খেমর রুজ-এর লোকেরা প্রায় নয় হাজার সাধারণ মানুষকে গুলি করে মেরেছিল। ট্যান আরো বলে চলল, 'কী অবস্থা ছিল সেটা ভাববার মতো নয়। চশমা পরা লোক দেখলে মেরে ফেলত। চশমা পরা মানেই সে ইন্টেলেকচুয়াল, বুদ্ধিজীবী।'

'টাকা ওরা কোথায় পেত? দেশে তো কলকারখানা তখন কিছু ছিল না।' বললাম আমি।

'ড্রাগস্। বর্মা, লাওস, আর কাম্বোডিয়া তো তখন ড্রাগস্-এর জন্য গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল। আমি দেখেছি সন্ধ্যাবেলা গাদা গাদা ডলার বস্তাবন্দি করে নিয়ে যেত। ঘটনাটা দেখে ফেলেছি বলে আমাকে একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিল তিন দিন। একটু জলও দেয়নি। কী করে বেঁচেছিলাম জানি না।'

কিলিং ফিল্ডস-এ এখন কিছু নেই। একটা মাঠ শুধু। মধ্যিখানে একটা মেমোরিয়াল আছে। তার তিন দিকটা অর্ধেক কাচ। মেমোরিয়ালটা শুধু মাথার খুলিতে ভর্তি। দেখলে গা শিউরে ওঠে। তবুও কাছে গিয়ে একবার দেখলাম। কোনোদিন ভুলব মনে হয় না। কাম্বোডিয়াতে যত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, প্রায় সবারই একইরকম অভিজ্ঞতা। এখন যারা ওপর মহলের আমলা, তারা পল পটের সময় সবাই ভিয়েতনাম পালিয়ে গিয়েছিলেন। আবার পরে এসে দেশের হাল (এবং নিজের হাল তো বটেই) ধরেছেন।

অদ্ভুত দেশ এই কাম্বোডিয়া। একসময় সভ্যতার শিখরে উঠেছিল। তারপর যতটা নামা যায় ততটাই আবার পড়েছিল। আবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তবে দুর্নীতি যাকে বলে চরমে। এবং উপজাতিদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকে। বড়ো শহরগুলো দেখলে বোঝা যায় না।

ফনোম পেন এসেছি কাজে। প্রায় এক বছর থাকতে হবে। এতদিন তো আর হোটেলে থাকা যায় না, তাই একটা সার্ভিসড ফ্ল্যাট নিয়েছি। ঘর পরিষ্কার করে যায়, কাপড়টাও কেচে ইস্তিরি করে দেয়। রান্নাটা নিজের। সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘর। বেশ চলে যায় আমার। খরচ এমন কিছু বেশি না। দিনে চল্লিশ ডলার। দৈনিক যা পাই খরচের জন্য, তার থেকে অনেকটাই বেঁচে যায়। গাড়ি আর ড্রাইভারও আছে। সকাল ন-টা থেকে কাজে লাগি। বিকেল ছ-টা বা সাতটায় কাজ শেষ হয়। আমাকে বাড়ি পৌঁছে আমার ড্রাইভারের ডিউটি অফ, যদি না আমার কোনো অফিসের কাজ থাকে। এতে আমার কোনো অসুবিধে নেই, বরঞ্চ নিজেকে একটু বাঁধনছাড়া মনে হয়। আমার রুটিন ঘরে ফিরে তারপর হাওয়া খেতে বেরোনো। একটা টুক-টুক, মানে স্কুটার-ট্যাক্সি ঠিক করেছিলাম, সে রোজ বিকেলে আমাকে নদীর ধার দিয়ে ঘুরিয়ে আনত।

ফনোম পেন শহরটা টনলে স্যাপ নদীর ধারে। দূরে মেকং নদীর সঙ্গে সঙ্গমটা দেখা যায়। সূর্যাস্ত অপূর্ব সুন্দর। আর বিকেলে নদীর খোলা হাওয়া তো ভালোই লাগে। নদীর ধার দিয়ে চওড়া রাস্তা চলে গেছে। নদীর পাড় চওড়া করে বাঁধানো, রাস্তায় আলোর কোনো অভাব নেই। পুলিশ প্রায় দেখা যায় না। রাত দশটা এগারোটা অবধি ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি সবাই নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। আমি ওখানে থাকাকালীন কোনো ক্রাইম দেখিনি, খবরও পাইনি।

শহর খুব পরিষ্কার, আর আমার সব থেকে ভালো লাগত যে বিকেলবেলা বাঁধানো জায়গা পেলেই লোকেরা এক্সারসাইজ করছে। দু-একজন যুবক-যুবতী বিরাট সাইজের স্পিকারে গান বাজাচ্ছে— সে ইংরেজি গানই হোক, বা বলিউডের গানই হোক, তার তালে তালে এক্সারসাইজ। ওই যুবক-যুবতীরাই ইন্সট্রাক্টর। আমাদের হিসেবে পাঁচ টাকা মতো দিতে হয়। দাঁড়িয়ে যাও, আর এক্সারসাইজ করতে থাকো। অফিসফেরত লোকেরা, গাড়ি, বাইক দাঁড় করিয়ে এক্সারসাইজ শুরু করে দিচ্ছে। দেখে মনে হয় এরা জীবনরসে ভরপুর। এই দেশটাই যে কিছুকাল আগে পর্যন্ত খেমর রুজের দখলে ছিল, যেখানে লোকেরা কথা বলতে ভয় পেত, সেটা ভাবাই যায় না।

লাওস, কাম্বোডিয়া, এসব দেশ তো এককালে ফরাসিদের কলোনি ছিল, তাই ফরাসি সংস্কৃতির প্রভাব সর্বত্র। বাড়ির ডিজাইন থেকে শুরু করে কাফে কালচার। রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাথের উপর কাফের টেবিল। বেশিরভাগেই বেশ আরামের বেতের চেয়ার লাগানো। বোসো, আর কফি বা বিয়ার খাও যত ইচ্ছে। অবশ্য অন্যান্য পানীয়ও পাওয়া যায়। এবং দাম কিছু বেশি না। ভারতীয় খাবারের দোকান অনেক আছে।

মুজতবা আলী সাহেবের কায়রোর আড্ডা আর ফনোম পেন-এর আড়ার মধ্যে অনেক মিল আছে। যদিও এসব আড্ডাতে স্থানীয় লোক খুব একটা বেশি থাকে না। হয় টুরিস্ট, কিংবা বিভিন্ন দেশের লোক যারা পাকাপাকিভাবে কাম্বোডিয়াতেই রয়ে গেছে। দু-একদিন একই ক্যাফেতে গেলেই আলাপ হয়ে যায়। তবে বিদেশিরা প্রায় সবাই পল পট যাবার পরেই এসেছে।

এখানেই এক ফরাসি ভদ্রলোকের কাছে, শুনলাম যে টুরিস্টরা খুব পপুলার নয় ফনোম পেনে। যদিও কোটি কোটি ডলার আসে টুরিস্টদের থেকেই। তবে বেশিরভাগ পর্যটকরাই আংকর ওয়াট দেখতে যায়। ফনোম পেনে যেসব লোক আসে তারা সাধারণত বাচ্চা খোঁজে, নিজেদের যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য। এটা সরকারের পক্ষে একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন টুক-টুকের পিছনে দেখবেন পোস্টার লাগানো, 'সেভ আওয়ার চিলড্রেন।' পরিচিত এক ফরাসি মহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমরা ক্যাফেতে বসে আছি। সামনে দিয়ে দুই শ্বেতাঙ্গ চলে গেল, দুটো বাচ্চার হাত ধরে। বাচ্চা দুটোর বয়স কত হবে, এই আট নয়। 'একটু বোসো তুমি, আমি একটা ফোন করে নিই।' ফোন করলেন হেল্পলাইন নম্বরে। 'আমরা অমুক ক্যাফেতে বসে আছি। এখুনি দুজন লোক, ককেশিয়ান, সামনে দিয়ে চলে গেল, রোড নম্বর ৬২-র দিকে। সঙ্গে দুটো বাচ্চা।' ওপাশ থেকে কি বলল শুনতে পেলাম না, পরিচিতা দুম করে ফোনটা টেবিলের উপর ফেললেন। 'এবসোলুমঁ দেণ্ডতঁ— অ্যাবসলিউটলি ডিসগাস্টিং। ওদের বলাতে ওরা বলল, কত লোককে ধরব বলুন, আমাদের এত পুলিশ নেই। তাহলে হেল্পলাইন খুলেছিস কেন হতভাগারা?'

পরে শুনলাম একশো ডলারে বাচ্চা ভাড়া পাওয়া যায় এক সপ্তাহের জন্য। বেশিরভাগ খরিদ্দারই ইউরোপ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা টেকনিশিয়ান আর টুরিস্ট। আমি ভাবলাম, এই লোকগুলো এদেশে উন্নয়নের কাজ করতে এসেছে। তার প্রথম ধাপ বোধহয় নিজেদের সভ্যতার নিদর্শন রেখে যাওয়া।

কাফের মধ্যে যেটা আমার সবথেকে প্রিয় সেটার নাম গ্রিন ভেসপা। ঢুকতেই দেখবেন একটা আদ্দিকালের সবুজ রঙের ভেসপা স্কুটার। আর সারা দেয়ালে ভেসপাতে চড়া অড্রি হেপবার্ন আর গ্রেগরী পেকের-এর ছবি— রোমান হলিডে সিনেমার। ক্যাফের মালিক এক সদাশয় আইরিশ ভদ্রলোক। প্রায় পঁচিশ বছর আছেন ওখানে। গল্প করতে ভালোবাসেন।

একদিন গ্রিন ভেসপাতে গেছি। সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একজন মহিলা। নাম হে সেলিনা। পেশায় পুরাতত্ত্ববিদ। সাধারণত হাসিমুখেই কথা বলে। আজ দেখছি একটু গম্ভীর। ক্যাফেতে বেশি লোক নেই। সবে অফিস টাইম পার হয়েছে। ক্যাফের রোজকার খদ্দেররা এখনও আসেনি। হে মাঝবয়সি, তবে মুখে-চোখে এখনও তার প্রভাব পড়েনি। কিংবা হয়তো ও রসে (মেকআপ বশে) বঞ্চিত বলে বুঝিনি।

সে যাক, হে বসেই দুটো বড়ো ব্র্যান্ডি নামালো। আম্মো একটা বুশমিল নামিয়েছি। মেজাজ শরিফ। খুবই। বললাম, 'আজ এত গম্ভীর কেন?'

'জানো, আসলে তো কাম্বোডিয়ার পুরাতত্ত্বের যা কিছু, তা ভারতীয়দেরই অবদান। সেই কবে মহারাজ সূর্যবর্মন-এর সময় থেকে। এজন্যই তো আমরা সমুদ্রমন্থন নিয়ে এত মাতামাতি করি। আঙ্কোরে গেলে দেখবে পুরো মহাভারত।'

মাথা নাড়লাম। আঙ্কোর-এর মহাভারত আমার দেখা হয়ে গেছে।

'সে তো জানি। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার গম্ভীর হবার সম্পর্ক কি?'

'কিছু না। এমনিই। অথচ দেখো, আজকের ক্যাম্বোডিয়ার সম্বন্ধে তোমরা, ভারতীয়রা, কতটুকু জানো?'

স্বীকার করলাম, সাধারণ ভারতীয়র কাছে কাম্বোডিয়া, 'কলকেতা-ডায়মন্ডহারবার-রানাঘাট-তিব্বত', প্রায় এই সিকোয়েন্স-এই পড়ে।

হে আর একটা ব্র্যান্ডি অর্ডার দিয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আজ হঠাৎ পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

আমার দিকে তাকাল, 'আমি আমেরিকান, জানো?'

গল্পের গন্ধ পেয়ে খোঁচালাম, জানি, কিন্তু কীভাবে আমেরিকান হলে সেটা জানি না।'

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ক্যাফেতে ভিড় বাড়ছে। কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই নজর টিভির দিকে। ফুটবল খেলা চলছে। টিভিটা বারের পাশে। আমাদের দিকে দু-একটা টেবিল এখনও খালি। হে চারপাশ একবার দেখে নিয়ে বললে 'ভিয়েতনামের যুদ্ধটা কাম্বোডিয়া অব্দি গড়িয়েছিল সেটা জানো নিশ্চয়ই।'

সেটা জানি। তাই বললাম।

'কতটুকু আর জানো? কাম্বোডিয়াতে যে ভিয়েতনামের লোকেরা ছিল, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল কাম্বোডিয়ান সোলজাররা। এটা সত্তর দশকের কথা। আমাদের গ্রাম ছিল মেকং-এর ধারে।'

হে-র চোখ ছাতের দিকে, কিন্তু মনে হল সেই চোখ দিয়ে পুরোনো দৃশ্য দেখছে। চোখ নামিয়ে বলল', এক রাতে গ্রামের একশোর উপর লোককে হাত বেঁধে নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা..... তিন ভাই... তারাও ছিল। হে-র গলা ভারী, কিন্তু চোখে জল নেই। বোধহয় অনেকদিন আগেই শুকিয়ে গেছে।'

হে বলে চলল, 'নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে সবাইকে গুলি করে মেরে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে মেকং-এর জলে ফেলে দিয়েছিল। আমার তখন কত বয়স? ষোলো-সতেরো হবে। বেয়নেটের খোঁচা মেরে সব বাচ্চাদেরকে দেখতে বাধ্য করেছিল। আমার এখনও মনে আছে।.... জানো, আমার মা পরের দিন মারা গেলেন। আমি কিছু করতে পারিনি। কিছু জানতামই না। আমার বড়ো বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তার তিনটে ছেলে-মেয়ে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার বোনের গ্রামেও একই ঘটনা ঘটেছে।

'আমার বাবা আর ভাইদের আমি দেখতেও পাইনি। অত লোকের ভিড়ে ওরা হারিয়ে গিয়েছিল। সোলজাররা মেশিনগান চালাচ্ছিল, আর রক্ত বইছিল চারদিকে।'

আমি নিজেই উঠে গিয়ে আর এক রাউন্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এলাম। বসে বললাম, 'তুমি কী করলে তারপর?'

'এক মাস ওই তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। খাবার তো ছিল না, কোথাও সোলজার মরে পড়ে আছে দেখলে দৌড়ে যেতাম, যদি তার রেশনের ব্যাগটা থাকে। নয়তো জঙ্গলে যা পাওয়া যায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হে, 'সেসব দিনের কথা আর মনে করতে চাই না, কিন্তু মনে পড়ে যায়। এখনও, এত বছর পরেও দুঃস্বপ্ন দেখি।'

'কিন্তু ওই অবস্থা থেকে বেরোলে কী করে?'

'ভাগ্য বলতে পারো। ততদিনে আমেরিকানদের বম্বিং শুরু হয়ে গেছে। কাম্বোডিয়াতে এক লক্ষ টনের বেশি বোমা ফেলেছিল ওরা। সে যাক, আমি একদিন একটা ভিয়েৎকং-এর সোলজারের ঝোলা হাতড়াচ্ছি। বাচ্চাদের ঝোপের মধ্যে বসিয়ে রেখেছি। ভিয়েৎকংদের কাছে খাবার প্রায় থাকতই না। শুধু ভাতের গোলা। পুরো দেশেই তখন খাবার নেই।'

'তারপর?'

'দেখি, আর এক দিক থেকে একজন মার্কিন সোলজার আসছে। আমি ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম আমাকে গুলি করে মারবে। বাচ্চাগুলোর কী হবে তাই ভাবছি আর ওঠবার চেষ্টা করছি। পা-টা মচকে গিয়েছিল। সেই সোলজারটাই এগিয়ে এল। গুলি করবার বদলে আমাকে ধরে তুলল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। যা হয়ে থাকে, তাই। সেই আজ এত বছর আমার স্বামী। ওই আমাকে আমেরিকায় নিয়ে গেল, সঙ্গে বাচ্চাগুলো। সে-সময় ভিয়েতনাম আর কাম্বোডিয়ার লোকেরা অনেকেই আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিল। আমরাও তাদের মধ্যে।'

একটু হাসলো হে, এতক্ষণ পরে।

'প্রত্নতাত্ত্বিক হলে কী করে?'

'কষ্ট করে। ভাষাটাও তো জানতাম না। পড়াশুনা স্কুল অব্দি। আমেরিকাতে গিয়ে গোড়া থেকে শুরু করেছিলাম।

আমার স্বামী আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। ভাগ্যিস ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরে রেফিউজিদের জন্য মার্কিন গভর্নমেন্ট অনেক রকম সুবিধা করে দিয়েছিল। তাও ডিগ্রি পেতে বারো বছর লেগেছে।'

'কিন্তু প্রত্নতত্ত্বই কেন?'

'আমি দেখেছি, নবম, দশম শতাব্দীর অনেক মূল্যবান শিল্প নিদর্শন লোকেরা জঙ্গল থেকে খুঁড়ে বার করে, কিংবা পুরোনো মন্দিরের গা থেকে ভেঙে সাইগনে বিক্রি করছে। এসব দেখে আমার মনে হয়েছিল যদি এগুলোর রক্ষা করবার জন্য কিছু করতে পারি।'

'আর তোমার বাচ্চারা?'

'এখন পাঁচটা। দিদির তিনটে, আর আমার দুটো। সবাই বড়ো হয়ে গেছে।'

'আর তোমার স্বামী?'

'দেশভ্রমণ করছে। ওর অনেকদিনের শখ। যুদ্ধের পর নিজের ব্যাবসা শুরু করেছিল। ভালোই চলছিল। বয়স বাড়তে আমরা ঠিক করলাম দুটো বছর আমরা নিজেদের জন্য দেব। ব্যাবসা বেচে দিলাম। আমি এখানে এলাম, আর আমার স্বামী

এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে ট্রেকিং করছে। এখানে আরো তিনটে বছর কাজ করব আমি। অনেক কাজ, তুমি তো জানোই। স্বামীকে বলেছি। আপত্তি করেনি। বলেছে নিজেও এখানে চলে আসবে ওর ঘোরা শেষ করে।'

থামল হে। ঘড়িতে দেখি সাড়ে সাতটা। ওঠা উচিত। নয়তো হে-কে ডিনারে নিয়ে যেতে হবে। অত ভালো চিনি না।

ফেরার সময় মনে মনে ভাবলাম, মানুষ কোথা থেকে কোথায় চলে যায়!

কাম্বোডিয়াতে কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম ওরা এখন নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে কতখানি সচেতন। হে-র মতো মানুষদের জন্যই হয়তো ওদের ইতিহাসটা বেঁচে যাবে। যে দেশ হে-কে এত দুঃখ দিয়েছে, সে-দেশেই ফিরে এসে কাজ করার মতো মানসিকতা ক-টা লোকের আছে আমি জানি না, হয়তো বেশি লোকের নেই।

গল্পটা বললাম এইজন্য, যে সবার তো হে-র মতো ভাগ্য হয় না, কিন্তু যাদের হয়, তারাই কি সবাই দেশ আর সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেয়? লোকেরা আলোচনা আর সমালোচনা করতে ভালোবাসে, কারণ তাতে স্বার্থত্যাগ করতে হয় না।

তবে হে-র মতো মানুষরাই আস্তে আস্তে কাম্বোডিয়ার চেহারা পালটে দিচ্ছে। অবশ্যই বাকি পৃথিবীর সাহায্যে। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এদের মধ্যে প্রধান। আবার যাকে বলে 'ভেস্টেড ইন্টারেস্টে' তাও কিছু কম নেই। সর্বপ্রধান চিন। তারপর ভিয়েতনাম। ভারতও আছে। তবে ভারত নানাভাবে সাহায্য করে। আঙ্কোর ভাট-এর মন্দির সংরক্ষণ থেকে শুরু করে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং মিলিটারি ট্রেনিং অবধি। চিনেরা ধার দিয়েই খালাস।

শহরে নতুন নতুন দোকান, শপিং মল, তবে বইয়ের দোকান খুঁজতে হদ্দ হয়ে যেতে হয়। পুরো শহরে আমি একটাই বইয়ের দোকান পেয়েছিলাম। সেকেন্ড-হ্যান্ড বই। এই নিয়ে প্রফেসর ড্রুক-কে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'পড়বে কে? যারা ছিল তাদের তো গুলি করে মেরেছে। আর নতুন প্রজন্ম মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। বই পড়া কাকে বলে জানেই না।'

অবাক হলাম। যতটুকু জানি, ক্যাম্বোডিয়ার সাহিত্য অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু ছিল একসময়। কথাটা তুলতে হাসলেন, 'বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা বহুযুগ আগের কথা। ডেমোক্র্যাটিক কাম্পুচিয়াতে বই পড়লে প্রাণ দিতে হত। তারপর এল ভিয়েতনামীরা। কাগজের সাপ্লাই কন্ট্রোল করল। প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু ছাপা হত না। আমরা স্বাধীন হবার পরেও অবস্থা ভালো হয়নি।' একটু দুঃখের হাসি হাসলেন, 'কমিউনিস্ট না হলেও কমিউনিস্ট মনস্তত্ত্বটা রয়ে গেছে। এখন টেক্সট বই, বা ওই ধরনের কিছু ছাড়া আর অন্য কিছু ছাপা হয় না।' হাসিটা একটু খোলা হল। 'হ্যাঁ, একটা জিনিস ছাপা হয় ঠিকই। হরোস্কোপ। চাহিদা দুর্দান্ত।' কড়িকাঠের দিকেই তাকিয়ে যোগ করলেন, 'পঞ্চাশ-ষাট দশকে বইয়ের বাজার খুব ভালো ছিল। বছরে অন্তত পঞ্চাশটা নতুন বই ছাপা হত।' আমি উত্তর দিলাম না। ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই।

আমার মনে হল, পৃথিবীর যেসব দেশ যুদ্ধের বলি হয়েছে, তাদের সবার কিন্তু এরকম অবস্থা নয়। যদিও সারা আফগানিস্তানে একটাই ইংরেজি বইয়ের দোকান, (যে দোকানটা নিয়ে একটা বই লেখা হয়েছিল) এবং লাইবেরিয়াতে একটাও নেই (যদিও লাইবেরিয়ার ভাষাটা ইংরেজি), কিন্তু বিশ্বযুদ্ধতে তো ইউরোপের অনেক জ্ঞানীগুণী প্রাণ হারিয়েছিলেন, ইউরোপ তো বই-বিমুখ হয়নি? কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়াতে বইয়ের অভাব দেখিনি। অবশ্যই সেন্সর হত, কিন্তু পাওয়া তো যেত। তাহলে আসল তফাত কোথায়? বিষয়টা সমাজতাত্ত্বিকদের জন্য রাখলাম।

স্বাদ বদলাবার জন্য পরিশিষ্টে একটু স্বাদের কথাই বলি। এ শহরের নামকরা রেস্তরাঁতে পাবেন ব্ল্যাক চিকেন। মুরগিটার মাংসটাই হয় কালো রঙের। স্যুপ বানিয়ে দেবে, স্যুপটাও কালো রঙের। আমার জানাবার কথা, জানালাম। আপনার খাওয়া না-খাওয়া আপনার ওপর। তবে দামটা সাধারণ চিকেনের তিন গুণ, এটা বলে রাখি।

দ্বিতীয় হচ্ছে সি স্করপিয়ন, মানে বলতে পারেন সামুদ্রিক বিছে। এও কালো রঙের, তবে খোলসটাই, মাংসটা নয়। খেতে একটু বড়ো কাঁকড়ার মাংসের মতো। সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরিমাণ মদ্যপান করেন, খুবই ভালো লাগবে। খাঁটি কম্বোডিয়ান রান্না।

আর শেষমেশ হল মাকড়সা। কাম্বোডিয়ানরা বড়ো বড়ো কালো রঙের মাকড়সা-ভাজা খেতে খুব ভালোবাসে। রাস্তায় দেখবেন বিক্রি হচ্ছে, আবার হকার ফিরি করছে, এও চোখে পড়বে। আমি খেয়ে দেখেছি কিনা সে কথাটা আপাতত গুপ্ত হয়েই থাক।

একটা ক্লাবের নাম না করলেই নয়। সেটা হচ্ছে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব। বিশেষত্ব এই যে, এটা পল পট-এর সময়তেও ছিল। তখন অবশ্য বিদেশি সাংবাদিকরা এখানে ছাড়া আর কোথাও যেতেও পারত না, আর অন্যদের আসা মানা ছিল। তবে এখন সবাই যায়। রেস্তরাঁ আছে। তবে পুরোনো কলকাতার ক্লাবের মতো একটা কলোনিয়াল ঐতিহ্য রয়ে গেছে। খাবার ভালো। এখনও সাংবাদিকদের ভিড় হয়, তবে আগের মতো না। পৃথিবীতে যাকে বলে 'হট স্পট,' তা এখন অন্য জায়গায় চলে গেছে। কাম্বোডিয়াতে এখন কোনো আকর্ষণ নেই। তবুও মরা হাতি লাখ টাকা। গেলে একবার ঘুরে নেওয়া ভালো। আর কিছু না হলেও কাম্বোডিয়ার রাজনৈতিক চেহারা আপনার কাছে স্পষ্ট হবে একটু।

আংকর ওয়াট

আংকর ওয়াটে বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ পর্যটক আসে। ধরে নেওয়া যেতে পারে অন্তত তিরিশ হাজার ভারতীয়। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা নিশ্চয় কম নয়। সে কারণে আংকর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। টুরিস্ট গাইডে দেখে নেবেন। একটা দুটো কথা বলে অন্য প্রসঙ্গে যাব। প্রথম, যদি মনে রোমাঞ্চ থাকে তাহলে সূর্যাস্তের সময় বাইরের বাগান থেকে পুরো মন্দিরটা দেখবেন। গোধূলির আলোতে শুধু বিয়ের কনেই নয়, মন্দিরও যে ভালো লাগে, তার প্রমাণ পাবেন। ইচ্ছা করলে কবিতা লিখতে পারেন নিজের প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে। কেউ দেখতে যাচ্ছে না। 'দাগ এ দিল, পথর কে আঁসু সে কুছ কম নহিঁ।'

কাম্বোডিয়ানরা বলে, আংকর ওয়াট বুদ্ধমন্দির। বিশ্বাস করা শক্ত। বায়ন-এর মন্দিরের মাথায় চতুর্মুখ দেবতা। ব্রহ্মা ছাড়া আর কোনো দেবতার চতুর্মুখ ছিল বলে জানি না। বুদ্ধর তো নয়ই। এছাড়া লম্বা দেওয়ালে দেখবেন পুরো মহাভারতের খোদাই করা ম্যুরাল। আর তা ছাড়া রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন যিনি আংকর ওয়াটকে বড়ো করেছিলেন তিনি বৌদ্ধ ছিলেন বলেও জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে খেমর রাজ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুই ধর্মেরই প্রচলন ছিল।

আংকর ওয়াট একসময় পৃথিবীর সব থেকে বড়ো শহর ছিল। এর আয়তন ছিল প্রায় এক হাজার বর্গ কিলোমিটার। অবাক ব্যাপার, ব্যবস্থাপত্র সবই প্রায় ছিল মেয়েদের হাতে। একসময় চাম (ভিয়েতনামীরা) আক্রমণে আংকর প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল। চক্রবর্তী মহারাজ সপ্তম জয়বর্মন তাদের তাড়িয়ে আবার আংকর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এবং আংকর থোম কমপ্লেক্সের (শহরের ভিতর শহর) স্থাপনা করেন। প্রায় একশোটা হাসপাতালই ছিল রাজ্যে। শিক্ষাপদ্ধতি খুবই উচ্চস্তরের ছিল। আদমশুমারি হত নিয়মিত। প্রশাসন করিৎকর্মা ছিল।

ইদানীং যেটা মুশকিল হয়েছে সেটা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম এখন কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রধর্ম। ওদের সরকারি লেটারহেডে লেখা থাকে রাষ্ট্র-ধর্ম-রাজা। নেশন-রিলিজিয়ন-কিং। সুতরাং তারা যে সব কিছুকেই বৌদ্ধ বলে চালাবে এ আর আশ্চর্য কি! যেটা কাম্বোডিয়ানরা এখনও উড়িয়ে দিতে পারেনি, সেটা হল সমুদ্রমন্থনের কাহিনিতে সাধারণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস। সর্বত্র দেখবেন দেবাসুরের লড়াইয়ের খোদাই করা প্রস্তর চিত্র। সাধারণ বাড়িতেও, এবং হোটেলের রেলিংগুলো পর্যন্ত সাপের মতো করে বানানো। তার পরও যে কী করে সব কিছু বৌদ্ধ হয়ে যায়...

যদি সেদিনই ফনোম পেনহ না ফিরে যান, তাহলে রাত কাটাবেন সিয়াম রেয়াপ শহরে। রাস্তায় দেখবেন কাম্বোডিয়ার যুদ্ধে পঙ্গু সাধারণ মানুষ। (বেশিরভাগেরই হাত-পা মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে), নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছে। অর্কেস্ট্রা। কেউ এক হাতে বাজাচ্ছে, কেউ এক পায়ে। ভিক্ষা করছে না। শুনবেন। উৎসাহ দিতে চাইলে পয়সা দিতে পারেন, বা সিডি কিনতে পারেন। ভাষা না বুঝলেও, আমার হিসাবে এটাই জীবনমুখী গান, কেননা এই বাজনাই এদের জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছে। খাওয়া শেষ করে রাস্তার ধারে কোনো ক্যাফেতে বসে কফি এবং ব্র্যান্ডি সহযোগে জীবন, রাষ্ট্রধর্ম, ইতিহাস, ইত্যাদির কথা চিন্তা করে দার্শনিক হবার চেষ্টা করতে পারেন।

লাওস

সবমিলিয়ে লাওসেও থাকতে হয়েছিল প্রায় চার মাস। বেড়াতেও গেছি, আবার কাজেও গেছি। শহর দেখেছি বেড়াবার সময়, আর গ্রাম দেখেছি কাজের সময়।

লাওস-এর লোকেরা হাসতে জানে। প্রচলিত কথা— ভিয়েতনামের লোকেরা ধান গাছ লাগায়, কাম্বোডিয়ানরা গাছের দেখাশোনা করে, আর লাওশিয়ানরা বসে বসে দেখে গাছ কেমন বাড়ছে। পুরো দেশটাই একটু ঢিমে তালে চলে। আর এমনি অবস্থা যে সবথেকে সহজ কাজ হল বিয়ার খাওয়া। ক্যাফেতে বসে বললেই হল 'বিয়ার লাও'। না, এটা হিন্দি নয়— বিয়ারটার নামই হল রিয়ারলাও-লাওস-এর বিয়ার। কত সুবিধা বলুন তো।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। আসলে বিয়ারের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। পাঠক, আপনারও আছে, অস্বীকার করবেন না। করলেও বিশ্বাস করছে কে?

সে যাক, লাওস-এর মানে হল লক্ষ হাতির দেশ। কিন্তু লাওসে আমি হাতি দেখিনি। প্রচুর জঙ্গল এবং পাহাড় আছে, নিশ্চয় হাতিও আছে। তবে বেশিরভাগ রাস্তার যা অবস্থা, বিশেষত পাহাড়ি জায়গায়, আমার ভাগ্য নিশ্চয়ই ভালো, যে দশ ফুট চওড়া রাস্তায় গাড়ির সামনে হাতি পড়েনি কখনো।

আমাদের পুরাণে বলে, সুমেরু পর্বত হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল, দেবতাদের রাজ্য। এর স্থান ভারতবর্ষ। পৌরাণিক হিসাব অনুযায়ী সুমেরু পর্বত গাড়োয়াল হিমালয়েতে। লাওশিয়ানরা বলে সুমেরু পর্বত লাওসে। বিশ্বাস না হলে ম্যাপ দেখতে পারেন। আমি যাইনি, অনেক হাঁটতে হয় মশাই। ওদের ধারনা এটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। যাঁরা কেনিয়া গেছেন তাঁরাও জানেন যে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর কাছেই আর একটা মাউন্ট মেরু রয়েছে। এরকম নাম কেন হল আমি জানি না। জানবার বিশেষ ইচ্ছাও নেই।

লাওসের সব শহরই প্রায় মেকং নদীর ধারে হওয়াতে তাদের একটা আলাদা পরিবেশ আছে। নদীর ধারে রাত্রে বাজার বসে, সবই প্রায় চাইনিজ আর থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। দর করতে হয়। ভিয়েনচানে বিশেষ কিছু দেখার নেই। ক্যাফেগুলো সেরকম কিছু নয়। তবে বেড়াতে গেলে বুদ্ধ পার্ক (সিং খুয়াং) নিশ্চয়ই যাবেন। যদিও নাম বুদ্ধ পার্ক, কিন্তু ষাট ফুট লম্বা আর তিরিশ ফুট উঁচু অনন্তশয়ানে বিষ্ণু, এছাড়া, গণেশের এবং অন্যান্য দেবতাদের মূর্তি আছে। অনেকগুলি দেখলাম কোনো এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের সৌজন্যে। দেখবার মতো জায়গা। শহর থেকে তিরিশ বা চল্লিশ কিলোমিটার হবে, ঠিক মনে নেই। তবে ভিয়েনচানে প্যাগোডা আছে যথেষ্ট এবং তাদের মধ্যে বেশ কিছু প্যাগোডা এবং স্তূপ দেখবার মতো। অন্তত একটা দিন সেই দেখতেই কেটে যাবে।

আমার হিসাবে লাওসে দেখবার এবং অন্তত পাঁচ দিন কাটাবার জায়গা হল লুয়াং প্রাবাং। ফরাসি প্রভাব, অন্তত স্থাপত্যে, এই শহরেই বোধ হয় সবথেকে বেশি। আর ক্যাফে কালচারও এখানেই বেশি চালু। তবে আগে যা বলেছি, এই ক্যাফে কালচার প্রায় বিদেশিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং বিদেশিদের অভাব নেই। আমি একটা ক্যাফেতে প্রায়ই যেতাম। লোকজনের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপও হয়েছিল। একদিন দেখি আমার পাশের টেবিলে এক ইংরেজ ছোকরা। বয়স তিরিশের সামান্য এপাশ কিংবা ওপাশ। টেবিলের তলায় শুয়ে এক বাঘা কুকুর।

কিছুক্ষণ পরে— গোটা দুয়েক বিয়ার তখন শেষ হয়েছে— কথাবার্তা শুরু হল। ছোকরার নাম স্টিফেন, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করতে লাওসে এসেছিল বছর পাঁচেক আগে, এখানেই থেকে গেছে। দেখে মনে হল কথা বলতে লজ্জা করছে। বুঝলাম কেন। ব্রেক্সিটের রেফারেন্ডাম সেদিনই হয়েছে। যাই হোক, নিজের অস্বস্তি কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্রেক্সিটের রেজাল্ট তো বেরিয়েছে, এখন কী করবে? বললে, 'আর ফিরে যাব না। ব্রিটিশ হিসেবে লজ্জা বোধ করছি।

জীবনে অনেক ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু ইংরেজ হিসেবে কাউকে লজ্জা পেতে এই প্রথম দেখলাম।

লুয়াং প্রাবাং এর অনেকটাই দুটো নদীর মধ্যিখানে। মেকং এক দিকে, আর অন্যদিকে নামকান। নামকান অনেক ছোটো অবশ্যই। তবে নদীর ধারে সুন্দর সব কাফে, রাত্রে দিনে খাওয়া যায়। শহরের মধ্যিখানে একটা রাস্তার উপর রাত্রে বাজার বসে, ফনোম পেনের-এর মতো। তবে অনেক ছোটো, আর সেজব্ব বোধহয় অনেক বেশি আকর্ষণীয়। বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটবেন, কোথাও দেখবেন পটুয়া কাপড়ের উপর গণেশের ছবি আঁকছে। দাম বলবে তিরিশ হাজার কিপ, অর্থাৎ চার ডলারের থেকে কিছু কম। কিনবেন। স্টাইল একেবারে অন্যরকম। বাজারের ভিতর দিয়ে চলে যাবেন টামারিন্ড রেস্তরাঁয়। সব থেকে ভালো লাওশিয়ান খাবার পাওয়া যায়। লাওস-এর খাবার থাইল্যান্ডের খাবারের সঙ্গে বেশি মেলে। ভাত দেবে, যাকে বলে স্টিকি রাইস। ছোটো ছোটো বাঁশের পাত্রে। তুলে, হাতে করে বল বানিয়ে সেটা স্যুপে ডুবিয়ে খেতে হয়। আর মেকং-এর মাছ তো আছেই।

দিনের বেলা এরও পাশের রাস্তায় যাবেন। এই রাস্তাটা নামকান নদীর পাশ দিয়ে যায়। বেশিরভাগ রাস্তা বাড়ি পুরোনো ফরাসি স্থাপত্যের নিদর্শন। এর মধ্যে কিছু বাড়ি এখন গেস্ট হাউস।

একটু এগিয়ে ডান দিকে ফিরবেন। রাস্তার শেষেই একটা দোকান। সেখানে লাওসের বিখ্যাত হুইস্কি ভিলেজে তৈরি হুইস্কি পাওয়া যায়। চোখে দেখবেন। খাসা জিনিস। নাম লাও লাও। দাম খুব সস্তা। তবে বলে রাখি, লাওসে 'চম্পা' বলে একটা হুইস্কি পাওয়া যায়, ওদেশেই তৈরি। মাত্র চার ডলারে এত ভালো হুইস্কি পৃথিবীতে আর কোথাও খাইনি— পেগ নয়, বোতল।

হুইস্কি চাখা শেষ হলে আবার ডান দিকে ঘুরে রাস্তা পেরোবেন। উলটো দিকে একটা ক্যাফে-কাম-বইয়ের দোকান। সবই প্রায় সেকেন্ড হ্যান্ড। বিভিন্ন ভাষায় নানারকম বই। বিয়ার বা কফি খাবেন আর বই পড়বেন। কিনতে ইচ্ছা হলে কিনবেন, না কিনলেও ক্ষতি নেই।

এক ফরাসি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। দোকানে বসে বই পড়ছেন। ইনিও পাকাপাকিভাবে লাওসে থাকেন। চাকরি করেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে। লাওশিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছেন, মেকং-এর ধারে বাড়ি কিনেছেন একটা। বললেন, পৃথিবী যেভাবে চলছে, তাতে আর কোথাও থাকা সুবিধের নয়। বাকি পৃথিবী তো লাওসকে ভুলেই বসে আছে। এরকম চলতে থাকলে বাকি জীবন শান্তিতে কাটানো যাবে। যার যার জীবনদর্শন।

লুয়াং প্রাবাং থেকে একটা জলপ্রপাত নিশ্চয়ই দেখতে যাবেন। নাম হল কুয়াং সি। গাড়ি রেখে দেড় কিলোমিটার মতো হাঁটতে হবে। পাহাড়ি পথ, তবে সুন্দর বাঁধানো বেশিরভাগটা। জলপ্রপাত দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। প্রপাতের ওপর দিয়েই একটা পুল বানিয়েছে, সেখানে দাঁড়ালে জলের ওপর দিয়ে বয়ে আসে ঠান্ডা হাওয়া আর জলের ছিটে, দুটোই উপভোগ করবেন। আর তারপর কাফে আর বিয়ার তো আছেই।

লাওস গরিব হলেও কিন্তু পরিচ্ছন্ন দেশ। গ্রামেও আমি এই পরিচ্ছন্নতা দেখেছি। কাজের জন্য বিভিন্ন গ্রামে যেতে হয়েছে।

মাইল কুড়ি পাকা রাস্তার পর হয়তো তার তিনগুণ রাস্তা কাঁচা। একটা গাড়ি কোনো রকমে যেতে পারে। আমি যাদের কাজে গিয়েছিলাম বিশ্বব্যাঙ্কের হয়ে, সেই সংগঠনটার নাম পভার্টি রিডাকশন ফান্ড। এরা চেষ্টা করছে গ্রামের লোকদের দিয়েই রাস্তা তৈরি করানোর। ৯০ শতাংশ টাকা ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। আর বাকিটা কমিটিই চয়ন করে। অবশ্য নিয়মানুসারে। আর গভর্নমেন্টের লোকেরা দেখে নেয় সব ঠিক হচ্ছে কিনা। এতৎসত্ত্বেও ডিজাইনে প্রায়শই ভুল হয়। এ ক-টা গ্রামে দেখলাম পাহাড়ের ওপর থেকে রাস্তা নামিয়েছে ঠিকই কিন্তু পাশে জলের নালাটা ভালো করে কাটেনি, যার ফলে বৃষ্টির জল গ্রামের ঠিক মাঝখান দিয়ে নদীর মতো বয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক অনেক টাকা দিচ্ছে রাস্তার জন্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো প্রায় পাঁচ-শো মিলিয়ন ইউরো দিয়েছে। অথচ ভিয়েনচান থেকে বেরোলেই রাস্তার অবস্থা কাহিল। দুর্নীতির একটা চেহারা। অথচ দেশের এমন অবস্থা যে অনেক ছোটো শহরের মধ্যে দূরত্ব হয়তো কুড়ি কিলোমিটার, কিন্তু ঘুরে আসতে হয় প্রায় দু-শো। এর মধ্যে আবার প্রদেশ এবং জেলাদের মধ্যে রেষারেষি আর রাজনীতি আছে। অন্তত এই ব্যাপারে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের থেকে পিছিয়ে নেই।

অনেক গ্রাম দেখলাম যা বছরে তিন মাস বাকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। গ্রামে নানারকম অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি পাওয়া যায় না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ৩৮ শতাংশ মাত্র বাচ্চাদের জন্ম হয় হাসপাতালে। ৫৬ শতাংশ মায়েরা প্রসবের আগে কোনোরকম ডাক্তারি সাহায্য পায় না। গন্ডগ্রামে যাওয়া একটা দুষ্কর ব্যাপার। কিছু কিছু স্কুল তৈরি হচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক আর অন্যদের সাহায্যে। টিচার হয়তো সপ্তাহে দু-দিন আসে। বেশিরভাগ গ্রামেই টিচারদের থাকার জায়গা নেই। রাত্রে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হয়। এতৎসত্ত্বেও টিচাররা আসে এবং পড়াশুনো হয়।

অবশ্য অন্যরকমও আছে। পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে একটা গ্রামে যাবার সময় দেখলাম সেগুন গাছের জঙ্গল। তার মধ্যে অনেক গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। আমাদের টিম লিডার সাতোশি ইশিহারার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সেদিকে। ও প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন গ্রামে মিটিং চলছে, প্রধান উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমাদের গ্রাম খুবই গরিব। আমাদের কিছুই নেই। বোকা বোকা মুখ করে বললাম, এত যে সেগুন গাছ কাটা দেখলাম, সেগুলো কি অন্য কেউ কেটে নিয়ে যায়?

সাতোশি ততক্ষণে আন্দাজ করেছে ব্যাপারটা। বললে, গ্রামে ক-টা মোটরবাইক আছে? এক ছোকরা বড়ো গলা করে বললে, তিরিশটা। এবার একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করা হল, দশ বছর আগে কটা মোটরবাইক ছিল? সে মাথা চুলকে বললে, একটাও না। ঘটনাটা পরিষ্কার হল। গাছ কেটে গ্রামের লোকেরা ফেলে রেখে দেয়। শহর থেকে আড়তদার এসে নিয়ে যায়। গাছ পিছু পাঁচ-শো ডলার মতো পায়। এটা কিছুই না। প্রথম কথা, গাছ কাটা হচ্ছে কেন? পর্যাবরণ সংরক্ষণের জন্য আইন রয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক সেখানে ছিল, গম্ভীর মুখে বললে, আমাদের কোনো ম্যাপ নেই যাতে আমরা বলতে পারি যে এই জঙ্গলটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ। আসল ঘটনা বুঝতে দেরি হয় না। লাওসের বন্যসম্পদ নষ্ট হচ্ছেই। এই নিয়ে একদিকে যেমন সরকারের মাথাব্যথা, তেমনি অন্যদিকে বছরে প্রায় ষাট লক্ষেরও বেশি বর্গফুট গাছ কেটে ভিয়েতনামে চালান হয়ে যায়। সেখানে ফার্নিচার তৈরি হয়ে বিক্রি হয় ইউরোপে।

তবে এই গ্রামেই একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হল। গ্রামের লোকেরা নিজেরা টাকা দিয়ে একটা পাকা বুদ্ধ মন্দির তৈরি করেছে। সেখানে ধার্মিকভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। নানারকম মন্ত্রপাঠের পরে সবাই সবাইয়ের হাতে সুতো বাঁধল। চমৎকার পরিবেশ। এরপর খাওয়া-দাওয়া। খোলা আকাশের নীচে টেবিল আর বেঞ্চ পেতে খাওয়া। সেইদিনই জবাই করা শুয়োরের মাংস, তাকে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে সেদ্ধ করা হয়েছে, সঙ্গে কচি বাঁশের তরকারি। নুন ছাড়া আর কোনো মশলা নেই বললেই হয়। এছাড়া বন থেকে পেড়ে আনা ফল, আর ছত্রাকের আচার। ভাত বলতে ওই স্টিকি রাইস। হাতে করে নিয়ে বল বানিয়ে, স্যুপে ডুবিয়ে খাও। স্যুপটাও বাঁশপাতা দিয়ে বানানো। যাঁরা মদ্যপান করেন না, তাঁদের জন্য কোকা কোলা (আমরাই নিয়ে এসেছি), আর আবালবৃদ্ধবনিতা খাচ্ছে লাও হাই। এটা গ্রামেই বানানো। অনেকটা বাংলাদেশের তাড়ির মতো, তবে কোনো বদগন্ধ নেই। যদিও ভাত থেকেই তৈরি হয়। সকাল দশটায় গ্রামে আসার পথে একজন আমলার বাড়িতে প্রাতরাশ সারতে হয়েছিল। এদেশের নিয়ম অনুযায়ী ফল ইত্যাদির সঙ্গে তিন পেগ লাও হাই খেয়ে ছাড়া পেয়েছিলাম আমরা সবাই। মহিলাদের উপর করুণা করে তাদের এক পেগেই রেহাই দিয়েছিল।

গত প্রায় সত্তর বছর ধরে নানারকম রাজনৈতিক উতোর-চাপানোর মধ্যে দিয়ে চলেছে। দেশে একটাই রাজনৈতিক দল— কমিউনিস্ট পার্টি। এবং দেশ হিসেবে অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। অথচ এ দেশে প্রকৃতির দান অপার। খনিজ পদার্থের অভাব নেই, আবার সেই খনিজ পদার্থ মাইনিং করতে গিয়ে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসছে। এটা খুব দুঃখের বিষয়। অন্যদিকে, লাওস এর উন্নতির হার, গড়পড়তা ৮ শতাংশ। পৃথিবীর মধ্যে তেরো নম্বর। এটা কিছু কম নয়।

দুটো কথা আরো বলব। উনিশ-শো তেষট্টি থেকে উনিশ-শো তিয়াত্তরের মধ্যে আমেরিকানরা কুড়ি লক্ষ টন বোমা

ছবি : ধীরাজ চৌধুরী

ফেলোছিল লাওসে। তখনকার জনসংখ্যা দিয়ে হিসেব করলে প্রায় মাথাপিছু এক টন। তুলনামূলকভাবে, পুরো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকানরা বোমা ফেলেছিল একুশ লক্ষ টন। এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, বেশিরভাগ জায়গায় যাওয়া মুশকিল। কোথায় যে 'আনএক্সপ্লোডেড অ্যামুনিশন' পড়ে আছেই, আর সে যে কখন ফাটবে, কেউ জানে না। এর ফলে পৃথিবীবিখ্যাত প্লেইন অফ জার্স, যেখানে দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যে বড়ো বড়ো মাটির জারে প্রগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন রয়েছে (জারগুলো আসলে কবর, আর ভারতের প্রাগৈতিহাসিক ড্রাভিডিয়ান কবরের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে), সেখানে যাওয়াই মুশকিল। অতি সাবধানে, মার্কামারা জায়গা দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। কোথায় যে বোমা বা মাইন রয়েছে কে জানে।

তবে আগে যা বলেছি, লাওস দেশ হিসেবে শান্ত। রাস্তায় পুলিশ দেখবেন না। আমি থাকাকালীন কোনোদিন কোনো মিছিল বা জনসভা দেখিনি। চিনের মতো এখানেও বোধহয় সব নিষেধ। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাইনি কখনো। আর প্রকৃতির অপার দান। লাওস গেলে মেকং নদীতে তো নৌকা চড়ে ঘুরবেনই, বিশেষ করে গোধূলিবেলায়, কারণ মেকং-এর ওপর সূর্যাস্ত ভোলবার নয়। সঙ্গে বিয়ার নিতে ভুলবেন না। ভাবছেন, এই লোকটা সারাক্ষণ বিয়ার বিয়ার করে কেন। আসলে, বিয়ার এর যা দাম, কফিরও প্রায় তাই। আপনার যা অভিরুচি।

শেষ কথা হল, লাওশিয়ানদের সৌন্দর্যবোধ। দুটো পাতা একটা ফুল দিয়ে এমন টেবিল সাজিয়ে দেবে, আপনি দেখতেই থাকবেন। কোনোরকম মোটা দাগের কারিগরি নয়। এটা অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশেই। তবে থাইল্যান্ডের লোকেরা যতটা পাবলিসিটি পায়, অন্যরা তত না। এটা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক।

প্রথমেই বলেছি, লাওস ঠিক টুরিস্ট দেশ নয়। লাওস তারিয়ে তারিয়ে চাখবার মতো দেশ। বন্ধুবান্ধব বানিয়ে আড্ডা মারবার দেশ। সন্ধ্যাবেলা মেকং-এর ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখবার দেশ। আর যদি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে চান, তাহলে তো কথাই নেই। তবে সাবধান, রাজনীতি আলোচনা করবেন না কখনো স্থানীয়দের সঙ্গে। তলায় তলায় ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে রেষারেষি তো আছেই, (দক্ষিণের হমংরা উত্তরের লোকদের দেখতে পারে না, আবার কমিউনিস্টদের ঘোর বিরোধী। সরকার এখানে সর্বেসর্বা। ওসব থেকে দূরে থাকাই ভালো। আম্মো বেশ আছি, এভাবেই থাকবেন। আদার ব্যাপারী... ইত্যাদি।

বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা : ২

অভিজিত গুহ

তারক দাশ, অমর্ত্য সেন ও মার্ক টগার

তারকচন্দ্র দাশের Bengal Famine বইটির গুরুত্ব নিয়ে নৃতাত্ত্বিক মহলে বিস্তৃত আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং ভারতবাসীর গর্ব অমর্ত্য সেনের লেখা Poverty and Famine বইতে দাশের বই থেকে বহু তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত অর্মত্য সেনের লেখা বইটির তথ্যসূত্রে সর্বাধিক উল্লিখিত লেখক তারকচন্দ্র দাশ। বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের উপর নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৃতাত্ত্বিকদের দ্বারা সংগৃহীত বিপুল তথ্যের এই ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করা বোধহয় দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণাকারী কোনো সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই সেন দাশকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু অমর্ত্য সেনের বইতে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে তারকবাবু যে-সমস্ত তথ্য হাজির করেছিলেন সেগুলির উল্লেখ বারংবার এসে পড়লেও, দুর্ভিক্ষের কারণাবলী সম্পর্কে দাশ যে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। দাশের অসামান্য গবেষণাকর্মটি শুধুমাত্র একরাশ তথ্যের সমাহার নয়। দুর্ভিক্ষের কারণ ও ওই ভয়ংকর দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব সে সম্পর্কেও দাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন। সেন বহুবছর বাদে এ ধরনের গবেষণা করেছেন এবং নিজের চোখে দেখে সমীক্ষার মাধ্যমে নয়, মহাফেজখানার তথ্য ঘেঁটে। দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের প্রধান অবদান হল খাদ্যাভাবে ওই দুর্ভিক্ষ যে হয়নি এই সত্য প্রতিষ্ঠা। দুর্ভিক্ষ হয়েছিল মনুষ্যসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের ফলে। সেনের গবেষণার বহু আগেই দাশ এই বিষয়ের উপর তথ্য সহকারে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন Bengal Famine বইতে। এ প্রসঙ্গে যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা হল দাশ খাদ্যের যোগান এবং তার অভাব সম্পর্কে তথ্যের সব ক-টি উৎস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। সেন কিন্তু মূলত তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধানকারী কমিশনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সম্পর্কে অতি সাম্প্রতিককালে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মার্ক টগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। টগার এ প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় তারকচন্দ্র দাশের গবেষণা অনেক বেশি পরিমাণে বৈজ্ঞানিক। বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে দাশ সবগুলি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সেটি অমর্ত্য সেনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। দাশ বলেছেন—

> আমাদের হাতে এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই যার দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় যে নিজের দেশবাসীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ধান বঙ্গদেশে উৎপন্ন হত না (দাশ ১৯৪৯ : ১০৪)।

১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য তারকচন্দ্র দাশ যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবতারণা করেছিলেন সে সম্পর্কে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক গবেষক মার্ক টগার তাঁর প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ওঁর সোভিয়েত রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণা বিশ্বখ্যাত। সম্প্রতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিয়ে টগারের প্রবন্ধ 'The Indian Famine Crisis of World War II' (British Scholar, Vol-I, Issue 2, 166-96, March 2009) আন্তর্জাতিক সম্মানে পুরস্কৃত। টগারের উক্ত প্রবন্ধটিকে আমেরিকার 'কৃষি ইতিহাস সমাজ' সংস্থা ২০১০ সালে কৃষির ইতিহাসের উপর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে 'ওয়েন রাসমুসেন' পদক প্রদান করেছেন। দীর্ঘ এই প্রবন্ধে প্রচুর তথ্য প্রমাণ সহযোগে টগার দেখিয়েছেন বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অমর্ত্য সেন ও অন্যান্য যে-সমস্ত গবেষকরা বাজার ও সরকারি ব্যর্থতাকেই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন তা আদৌ যথেষ্ট পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। টগার দেখিয়েছেন সেন ও তাঁর সহযোগীরা তদানীন্তন বঙ্গদেশের ফসল উৎপাদন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

করতে গিয়ে তথ্যের সবগুলি উৎস ঘেঁটে দেখেননি। ফলে সে-সময় সত্যিই ফসল উৎপাদন ঠিক কতটা হয়েছিল এবং তার প্রকৃত অভাব ঘটেছিল কিনা সে সম্পর্কে অর্মত্য সেনের বই পড়লে সম্যক ধারণা তৈরি হয় না। টগার এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তারকচন্দ্র দাশের Bengal Famine বইটির উল্লেখ করেছেন। তদানীন্তন বঙ্গদেশের ফসল উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে দাশ চারটি উৎস থেকে খুঁটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন: 'ঠিক কতটা কৃষিজমির উপর ধান উৎপন্ন হত সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব' (দাশ ১৯৪৯:৯৮)। ফলে ফসল উৎপাদন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অথচ সেন ও তাঁর সহযোগীরা শুধুমাত্র তথ্যের একটি উৎস ব্যবহার করে সেটিকেই 'অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য' হিসেবে ধরে নিয়ে নিজেদের তত্ত্বকে সঠিক বলে দাবি করেছেন। উপরন্তু সেন দাশের গবেষণা সম্পর্কে তাঁর বইতে একাধিকবার উল্লেখ করলেও ফসল উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দাশ যে-সমস্ত মন্তব্য করেছেন সেগুলি সম্পূর্ণ চেপে গেছেন (টগার ২০১০: ১৭৩)। টগার তাঁর প্রবন্ধে এ সম্পর্কে সোজাসাপটা ভাষায় মন্তব্য করেছেন—

> সেন, গ্রিনো ও অন্যান্য গবেষকরা দাশের বইটির কথা জানতেন, উল্লেখও করেছেন এবং এটিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে ব্যবহারও করেছেন। অথচ এরা কেউই দাশের বইয়ের যে সমস্ত তথ্য এবং যুক্তি ওদের তত্ত্বকে সরাসরি খণ্ডন করেছে, সে প্রসঙ্গগুলি উল্লেখই করেননি। এই সমস্ত গবেষকরা হয় দাশের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পড়েন নি অথবা জেনে বুঝেই সেগুলির উল্লেখ করেননি যেহেতু দাশের তথ্য ওদের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। (টগার ২০১০:১৭৫)।

তারকচন্দ্র দাশ ও অমর্ত্য সেন সম্পর্কে টগার তাঁর আলোচনা এভাবেই শেষ করেছেন। আমরা শুরু করব এরপর থেকে।

দুর্ভিক্ষের কারণ, কৃষকের দুর্দশা ও পরিত্রাণ

বঙ্গদেশে ১৯৪৩-এর মহাদুর্ভিক্ষের উপর যে অসামান্য সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা তারকচন্দ্র দাশ ও তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দ করেছিলেন তারই ফলাফল Bengal Famine বইয়ের প্রথম দশটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। এই বইয়ের একাদশ অধ্যায়টির শিরোনাম 'Causes of the Famine of 1943'। এটি বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কথা অর্মত্য সেন তাঁর Poverty and Famine বইতে আলোচনা করেননি। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই দাশ বলেছেন মহাদুর্ভিক্ষের কারণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। দাশ প্রথম ভাগটির নাম দিয়েছেন, মূল কারণসমূহ বা 'basic causes' এবং দ্বিতীয় ভাগটির নাম সহযোগী কারণসমূহ বা 'contributory' বা 'immediate causes'। প্রথম ভাগের মধ্যে উনি ৯টি কারণের উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে আছে ১১টি কারণ। প্রথম ভাগের কারণগুলি উল্লেখ করা যাক।

(১) বঙ্গদেশে যে খাদ্যশস্যগুলি উৎপন্ন হয় তা অধিবাসীদের পক্ষে অপ্রতুল।

(২) বেশিরভাগ বাঙালিই কৃষিজমির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এদের পক্ষে কোনোরকমে দু-বেলার খাদ্য জোগাড় করা এবং খাদ্যের অভাবে দিন কাটানোর মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই।

(৩) বঙ্গদেশের কৃষিজমিগুলি আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ছড়ানো।

(৪) গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রচালিত শিল্পের অনুপস্থিতি ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলির ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তি।

(৫) খাদ্যশস্যের জমিতে পাটচাষের বিস্তৃতি।

(৬) ম্যালেরিয়া ও অপুষ্টিজনিত কারণে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি।

(৭) ঠিকঠাক সেচ ব্যবস্থার অভাবে প্রকৃতিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা।

(৮) বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতির অনুপস্থিতি।

(৯) শিক্ষার অভাব।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় তারকচন্দ্র দাশ বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেমন তদানীন্তন সবগুলি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ঠিক তেমনই দুর্ভিক্ষের কারণ বোঝার জন্য কোনো সম্ভাব্য সূত্রকেই ছেড়ে দেননি। আমরা তারক দাশ বর্ণিত মূল কারণগুলির মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণদুটি নিয়ে আলোচনা করব।

কারণ বঙ্গদেশের কৃষি ব্যবস্থার মূল সমস্যা বোঝার জন্য এ দুটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দাশ প্রথমেই বলেছেন ১৯৩১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী বঙ্গদেশের ৭০ শতাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৯৩১ এবং ১৯৪১-এর জনগণনার থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি বেরিয়ে আসে সেটি হল কৃষির উপর নির্ভরশীল প্রায় ৮০ লক্ষ গ্রামীণ মানুষের সিংহভাগ যে পরিমাণ জমির অধিকারী সেই জমিতে উৎপন্ন ফসলে তাদের কোনোরকমে দু-বেলার খাবার জোটে। মনে রাখতে হবে এই কৃষি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি নয় এবং তা মূলত বৃষ্টিনির্ভর। ফলে কোনো বছর সামান্য বৃষ্টিপাত কম হলেই খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। তা ছাড়া আছে কীটপতঙ্গের উৎপাত। দুর্ভিক্ষপীড়িত যে পরিবারগুলির অর্থনৈতিক চিত্র দাশ তাঁর বইতে তুলে ধরেছেন সেখানে দেখা যায় ওই পরিবারগুলির ৭৮ শতাংশই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায়

পালিয়ে আসার আগে কোনো কৃষিজমি ছিল না। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী অবস্থা। তারকবাবু বলেছেন দুর্ভিক্ষজনিত খাদ্যাভাবের অনেক আগে থেকে এইসব পরিবারগুলি চরম অভাবে ভুগছিল। দুর্ভিক্ষের খাদ্যাভাবের ধাক্কায় তারা গৃহহারা হয়। যদি বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি ঘটানো যায় তাহলে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি আদৌ অসম্ভব নয়। এই ছিল তারক দাশের অভিমত।

বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্ভিক্ষ-পূর্ব দুর্দশার বর্ণনা করতে গিয়ে এই অসাধারণ নৃতাত্ত্বিক দুর্ভিক্ষের মূল কারণগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এইসব কারণগুলির মধ্যে কৃষিজমি খণ্ডগুলির ক্ষুদ্রতা ও ছড়িয়ে থাকার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দাশ যে আলোচনা করেছেন তা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেও প্রযোজ্য। তারকবাবু বলেছেন ১৯২১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বঙ্গদেশের কৃষকরা মাথাপিছু ২ একরের সামান্য বেশি জমির অধিকারী। একই সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের একজন চাষি এর প্রায় দশগুণ বেশি জমির মালিক। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জমির পরিমাণ প্রায় ৩৮ গুণ বেশি। তাছাড়া বঙ্গদেশের কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই ভূমিহীন। এই তথ্যের জন্য তারক দাশ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি সমীক্ষার উপর নির্ভর করেছেন। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী ভূমিহীন এবং ২ একরের চেয়ে কম পরিমাণ জমির অধিকারী কৃষকরা কৃষির উপর নির্ভরশীল মোট পরিবারগুলির প্রায় ৭৯ শতাংশ। এইসব পরিবারগুলির পক্ষে ৬ জন সভ্যবিশিষ্ট পরিবারের দু-বেলা অন্ন জোটানোই ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। এটি অবশ্য দুর্দশার চিত্রটির একপিঠ। বঙ্গদেশের কৃষিনির্ভর পরিবারগুলির জমিখণ্ড শুধু ক্ষুদ্রই ছিল না, এই জমিখণ্ডগুলি ছিল খুবই ছড়ানো-ছিটানো। বাংলার গ্রামের বাসস্থানগুলি ভৌগোলিক কারণে কৃষিজমির থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। এছাড়া একই মালিকের ভূমিখণ্ডগুলি কখনই একসঙ্গে থাকে না। ফলে একজন কৃষককে একইসঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জমির উপর চাষের সমস্ত কর্মকাণ্ডই চালাতে হয়। এর ফলাফল কৃষির উন্নতির পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। দাশ এ সম্পর্কে ১৯৩৭ সালে B.P. Jain-এর লেখা এক অসাধারণ গবেষণা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। B.P.Jain-এর লেখা বইটির নাম Agricultural Holdings in United Provinces; Jain দেখিয়েছেন কৃষকের কায়িক শ্রমের পেছনে খরচের পরিমাণ প্রতি ৫০০ মিটার দূরত্বের জন্য ৫.৩ শতাংশ বেড়ে যায়। ওই একই খরচ জমিতে দেবার সার বহন করতে বাড়ে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ এবং ফসল বহন করার খরচ বাড়ে ১৫ থেকে ৩২ শতাংশ। আরো আকর্ষণীয় ঘটনা হল কৃষকের মালিকানাধীন জমিগুলি যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে কৃষিপ্রযুক্তির উন্নতি সাধন ছাড়াই কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের কৃষকের জীবনে এটা একটা মস্তবড়ো ট্র্যাজেডি। এরপর দাশ বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডগুলির সীমানা নির্ধারণকারী মাটির আল দেওয়ার ফলে যে বিপুল পরিমাণ কৃষিযোগ্য উর্বরা জমি নষ্ট হয় তার বর্ণনা করেছেন। B.P. Jain-এর গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে সূত্র সন্ধান করে দেখিয়েছেন পাঞ্জাবে বৃহৎ ভূমিখণ্ডে আলের পরিমাণ বঙ্গদেশের তুলনায় অনেক কম। বঙ্গদেশে আল দেওয়ার ফলে কম করে ৩ শতাংশ উর্বরা জমি কাজে লাগে না। পাঞ্জাবে এর পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ। বঙ্গদেশে শুধু আল দিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করার ফলে প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার একর উর্বরা জমিতে কোনরকম চাষ করা সম্ভব নয়। এছাড়া ছোটো জমির আছে আরো একগুচ্ছ অসুবিধে। একজন কৃষকের পক্ষে তার ছোটো ছোটো ছড়িয়ে থাকা ভূমিখণ্ডগুলিতে একই জলের উৎস থেকে সেচের ব্যবস্থা করা রীতিমতো কঠিন কাজ। একইসঙ্গে সবগুলি জমির রক্ষণাবেক্ষণ করাও দুরূহ। জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে নিয়ত মামলার খবরও পাওয়া যায় বঙ্গদেশে। সর্বোপরি উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী জমি ক্রমেই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। কৃষি হয়ে ওঠে অলাভজনক এক জীবিকা।

বস্তুত ১৯৪৩-এর পর থেকে বঙ্গদেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে বহু পরিবর্তন ঘটলেও এই প্রদেশের কৃষির উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য আজও বেশ ভালোভাবেই বিদ্যমান: (১) ভূমিখণ্ডগুলির ক্ষুদ্রতা ও ছড়িয়ে থাকা এবং (২) মূলত বৃষ্টিনির্ভর চাষ। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের পরে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র জোতের কৃষকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। আজও পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জমিই এক ফসলি এবং বৃষ্টিনির্ভর। উপরন্তু বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতি এবং নব্য শিল্পায়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষককুল আজ নতুন এক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এই নয়া সংকটের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। সুতরাং আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে তারকচন্দ্র দাশ মহাদুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যে অসম্ভব পরিশ্রমী সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে দিকনির্দেশকারী। অথচ এইরকম মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থটির মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক করলেন না। সুদূর আমেরিকার ঐতিহাসিক মার্ক টগার তারক দাশের গ্রন্থ যতখানি যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছেন এবং তার প্রশংসনীয় দিকগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট করে দেয়। ফিরে আসি তারক দাশের গ্রন্থে। ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের সমস্যাগুলি বর্ণনা করার পর দাশ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। উনি প্রশ্ন করেছেন কৃষির এত দুর্দশা সত্ত্বেও কেন অধিকাংশ মানুষ

পুরুষানুক্রমিকভাবে কৃষিতেই নিযুক্ত? এর উত্তর একটাই। কৃষি ছাড়া অন্য কোনোরকম জীবিকার পথ বঙ্গদেশের মানুষের সামনে খোলা ছিল না। দাশ তদানীন্তন Land Revenue Commission-এর রিপোর্ট (১৯৪০) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

> শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন অবশ্যই কাম্য এবং তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনসংখ্যার একটি অংশকে কৃষি থেকে সরিয়ে শিল্পে নিযুক্ত করা।

বঙ্গদেশে যে পাটকল ও সুতোর মিলগুলি আছে সেগুলিতে নিযুক্ত প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই এই প্রদেশের বাইরে থেকে আগত। বঙ্গদেশের কুটিরশিল্প বৃটিশদের হাতে বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গেছিল। এরকম অবস্থা থেকে মুক্তির একটাই বড়ো উপায় হতে পারে গ্রামীণ এলাকায় ছোটো ছোটো পাট ও সুতোর কল স্থাপন। এছাড়া রেশম ও লাক্ষার শিল্পও স্থাপন করা উচিত। আর হতে পারে ফল থেকে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী ছোটো ছোটো কারখানা। একসময় বঙ্গদেশে কাঁসা, পিতলের তৈরি বাসনপত্রের কুটিরশিল্প বহু পরিবারের অন্নসংস্থান করত। ইংরেজ শাসনের জাঁতাকলে পড়ে সেগুলিও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তারক দাশ এইসব ঘটনাগুলির কথা বর্ণনা করেছেন এবং শিল্পায়নের অভাব যে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষির উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুর্ভিক্ষের মুখে খুব সহজেই ঠেলে দিয়েছিল এরকম একটা যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যে ঠাসা আলোচনা করেছেন তাঁর Bengal Famine নামে অমূল্য গ্রন্থটিতে। আজও বঙ্গদেশের কৃষক ও কৃষির দুর্দশা এবং তার থেকে পরিত্রাণের হদিশ এবং কৃষি সংক্রান্ত নতুন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার দিকনির্দেশ পাওয়া যায় তারক দাশের লেখায়।

শেষ কথা

১৯৪৩-এর মহাদুর্ভিক্ষ আসলে বঙ্গদেশের কৃষকের চরম দারিদ্র্য ও কৃষির অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থারই পরিচয় দেয়। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারকচন্দ্র দাশ কৃষি ও কৃষকের সমস্যাগুলি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিপুল পরিমাণ তথ্যের সাহায্যে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সমস্যাগুলি তুলে ধরেই উনি থেমে থাকেননি। সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন পথের সন্ধানও করেছেন। শুধু কয়েকটি লঙ্গরখানা চালু করে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত হাজার হাজার মানুষের জন্য সাময়িক ত্রাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না একথা তারক দাশ বার বার তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 'দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হবে' (How to combat famine পৃ. ১২৩-১৩০) এই শিরোনামে দু-ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আলোচনা করেছেন। দু-ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে একটি হল 'দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ' (Long range measures)। দ্বিতীয়টি 'আশু পদক্ষেপ সমূহ' (Immediate measures)। দীর্ঘস্থায়ী দুটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে দাশ বলেছেন বঙ্গদেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল কৃষির উপর প্রায় চার কোটি মানুষ নির্ভরশীল। এর ফলে কৃষিজমির উপর প্রতিনিয়ত যে অসম্ভব চাপ পড়ে তা কমানোর উপায় দুটি। এক, কৃষির উন্নতি ও দুই, শিল্পায়ন। তারক দাশের মতে উপরিউক্ত দুটি উপায় অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একইসঙ্গে এই দুটি উপায়কে কাজে লাগাতে না পারলে দুর্ভিক্ষ কিংবা খাদ্য সংকটের প্রকৃত মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় ছোটো ছোটো ছড়িয়ে থাকা ভূমিখণ্ড। এই ভূমিখণ্ডগুলিকে একসঙ্গে জোড়া দেবার একটাই উপায়। সেটি হল সমবায় প্রথায় কৃষিকর্ম সংগঠিত করা। এই কৃষি সমবায়গুলি হবে সমস্ত জমির মালিক। প্রত্যেকেই হবে সমবায়ের অংশীদার। কৃষির উৎপাদন থেকে যে লাভ হবে তার অংশ কম-বেশি সকলেই পাবে। এই সমবায়গুলিই গ্রাম উন্নয়নের নানা কাজ করবে। কৃষিতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারে বিক্রি করার দায়িত্বও থাকবে এই সমবায়গুলির উপর। এরই পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে নানা গ্রামীণ কুটির শিল্প। সুতোর কল, পাটকল, রেশম ও গালা শিল্প ইত্যাদি। কৃষি বনাম শিল্প নয়, 'কৃষির শক্ত ভিত্তির উপর শিল্প' ঠিক এরকমও নয়। কৃষি ও শিল্প গড়ে উঠবে পাশাপাশি। অনেকটা এরকমই পরিকল্পনা করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের আমলের গোড়ার দিকে। এই ধরনের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জেলা পরিষদ ও খড়্গপুর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক অজিত নারায়ণ বসুর নেতৃত্বে। ওঁরা নাম দিয়েছিলেন 'গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রাম পরিকল্পনা'। গ্রাম সম্পর্কে গ্রামেরই মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের যে পরিকল্পনায় আশির দশকে মেদিনীপুর জেলা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তারক দাশ বহুকাল আগে দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সে ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথাই বলেছিলেন। দাশের ভাষায়—

> We want men of imagination at the top and men of action below and both these classes should have an intimate knowledge of the villagers and their socio-psycho-economic problems (দাশ ১৯৪৯: ১২৬)।

ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল আদিবাসী সমাজের সমস্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে কৃষির মূল সমস্যা এবং কৃষি ও

শিল্পের প্রকৃত মেলবন্ধনের কাজে তারকচন্দ্র দাশের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা আজও প্রাসঙ্গিক একথা বলেই শেষ করলাম।

তথ্যসূত্র

Beteille, A. 1997. 'Newness in sociological enquiry', Sociological Bulletin, 46(1): 97-110.

Beteille, A. 2000 'Teaching and research', Seminar, November 496. pp 20-23.

Beteille, A. 2013 "Ourselves and Others". Annual Review of Anthropology. 42: 1-16.

Das, T.C. 1945. The Purums: An old Kuki tribe of Manipur. Calcutta: Calcutta University.—1949. Bengal famine (1943): As revealed in a survey of the destitutes of Calcutta. Calcutta. Calcutta University.

Gaillard, G. 2004. Routledge dictionary of anthropologists. London: Routledge.

Guha, A. 2010. "Bengal famine and a forgotten author", Frontier, 43 (12-15): 30.

Guha, A. 2011. "Tarak Chandra Das: A Marginalised Anthropologist" Sociological Bulletin 60(2): 245-265.

Guha, A. 2016. Tarak Chandra Das: an unsung hero of Indian anthropology. Delhi: Studera Press.

Nehru, J. 1981/1946. The Discovery of India. New Delhi: Oxford University Press.

Ray, S.K. 1974. Bibliographies of eminent Indian anthropologists (with life-sketches). Calcutta: Anthropological Survey of India.

Sen, A. 1999. Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. New Delhi: Oxford University Press.

Tauger, M. 2009. 'The Indian famine crises of World War II', British scholar, 1(2): 166-96.

Uberoi, P. N. Sundar and S. Deshpande. 2007. 'Introduction: The professionalisation of Indian anthropology and sociology-People, places and institutions', P. Uberoi, N. Sundar and S. Deshpande(eds): Anthropology in the East: Founders of Indian sociology and anthropology (1-63), Ranikhet: Permanent Black.

Vidyarthi, L.P. 1970. 'Foreword', in S. Roy: Anthropologists in India: Short biography, bibliography and current projects) (v-xvii). New Delhi: Indian Anthropological Association.—1978. Rise of anthropology in India: A social science orientation (2 vols.). New Delhi: Concept Publishing Company.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন শুভনীল। ওঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্সের কাছে। ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাস নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার জন্য উক্ত সংস্থার সিনিয়র ফেলো হিসেবে আমাকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন দিল্লির ওই সংস্থা। আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই IDSK-এর অধিকর্তা অচিন চক্রবর্তীকে ভারতীয় নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দেবার সুবাদে।

চিঠির বাক্সো

এই নির্বাচনে বামপন্থীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এর পর বামপন্থীদের কি কোনো ভূমিকা থাকবে? আমাদের উত্তর, বামপন্থীদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল— কাজ আরো কঠিন হল। তাদের কাজ অবহেলিত শোষিত মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম করা। পাশাপাশি তাদের কাজ বস্তুবাদ তথা যুক্তিবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটানো আর সমাজকে এই কথা বোঝানো যে ধর্মের কারণে মানুষকে কিছুতেই ভাগ করা যায় না। ধর্ম জিনিসটা মানুষেরই সৃষ্টি, তার কোনো অলৌকিক উৎস নেই।

বিজেপি ক্ষমতায় চলে আসায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় বামপন্থীদের ভূমিকা হবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত একটি সংগঠিত নৈতিক শক্তি হিসেবে বামপন্থীদের কাজ করে যেতে হবে। 'যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খাওয়াও ভালো' জাতীয় অমানবিক কুযুক্তি দেখিয়ে তাঁদের ইফতারে অংশ নেবার কোনো দরকার নেই। দরকার, তাঁদের অধিকারের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

আশা করি চিরদিনই বামপন্থীরা তাঁদের এই ভূমিকা পালন করে যাবেন মানবিকতার স্বার্থে, সাম্য ও শান্তির স্বার্থে। এই ভূমিকাতেই তাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন— রাষ্ট্রক্ষমতার বিপ্রতীপে এই ক্ষমতার অধিষ্ঠান।

তমোনাশ বিশ্বাস
বিধাননগর

২

'আরেক রকম' পত্রিকার ১-১৫ এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যায় লিখিত শিকাগো বক্তৃতা ও 'ভারততীর্থ' (লেখক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়) প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬-৩০ এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যায় একটি চিঠি লিখেছেন মাননীয় শ্রী তমোনাশ বিশ্বাস। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে এই চিঠির অবতারণা। প্রথমত, পত্রলেখক বলেন যে, '...আর রামকৃষ্ণ মিশনগুলি ও তাদের স্থাপিত ইস্কুলগুলি হয়ে ওঠে হিন্দু ধর্মচর্চার এক-একটি কেন্দ্র। ...বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের প্রকৃত অবদান এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলায়, এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিচর্চার ধারার বিপরীত ধারাটি তৈরি করায়।' রামকৃষ্ণ মিশনে পঠনপাঠনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি (২০১০-২০১৩) শিক্ষাবর্ষে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে স্নাতকস্তরে সাম্মানিক বাংলা বিভাগের ছাত্র) যে, মোটেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মচর্চার কেন্দ্র নয়। যথেষ্ট ঔদার্য সহকারে ঠাকুর-মা-স্বামীজির আদর্শকে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে শিক্ষাদানের উন্মুক্ত পরিসর এখানে গড়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পত্রলেখক বলেন, '...তিনি নিবেদিতার টাকায় জমি কিনে বেলুড়ে 'রামকৃষ্ণ মঠ' গড়ে তুলেছিলেন যা পরে বহুভাবে বিস্তার লাভ করে।' এই তথ্য সর্বৈব ভ্রান্ত। না জেনে অথবা জেনে-শুনে মিথ্যা কথা বলা কোন রকমের যুক্তিবাদ সেটাই আশ্চর্যের। বক্ষ্যমাণ পত্রিকারই ১৬-৩১ মার্চ ২০১৯ সংখ্যায় *পুনঃপাঠ* অংশে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটি ('সমাজ' প্রবন্ধ সংকলনভুক্ত)। উক্ত প্রবন্ধে বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন: '...অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' অন্যত্রও তাঁর অভিমত: '...বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। বিবেকানন্দের এই

বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।' তাই, *ভারততীর্থ* রচনার নেপথ্যে শিকাগো বক্তৃতা থাকতেই পারে। অবশ্য, এহেন অভিনব বিষয়ে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সন্ধানী আলোকপাত আরেকটু বিস্তৃত হতেই পারত। আরেকটি স্বোপার্জিত পর্যবেক্ষণ দিয়েই শেষ করছি। অশোক মিত্রের অবর্তমানে পত্রিকাটি ক্রমেই দলীয় মুখপত্রে পর্যবসিত হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যুক্তিহীন যুক্তিবাদ ধর্মান্ধতার হাতকেই শক্তিশালী করে। অলমিতি,

বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য্য
শ্রীরামপুর

৩

সপ্তম বর্ষ নবম সংখ্যা (১-১৫ মে, ২০১৯) যথারীতি আকর্ষণীয়। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি মতামত (নেশন, ন্যাশনালিটি ইত্যাদি বিষয়ে) সম্বলিত উদ্ধৃতি এর মর্যাদা বাড়িয়েছে। সত্যিই দেশ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে (এগিয়ে যাচ্ছে কী?) তা বেশ উদ্‌বেগজনক। উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ করাল মূর্তি আমাদের যথেষ্ট সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র জন্মদিন পালনের যথার্থ উপায় হল রবীন্দ্রনাথের রচনার পুনঃপাঠ।। সম্পাদকীয় সচেতনতা সেই দায়িত্ব পালনে যে সক্রিয় তা দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাচে গানে আবৃত্তিতে উত্তাল সারা দেশ তাঁর আদর্শ ভাবনাগুলির সঙ্গে অথচ আজও সম্যক পরিচিত নন। মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ পাবার যোগ্য। এই বোধ হয় এ পত্রিকার আরেক রকম হয়ে ওঠার অন্যতম একটি উদাহরণ। নেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এসেছিল যেসব চিরকালীন সত্য উদ্‌ঘাটন তার চর্চা আরো বেশি করে হওয়া দরকার। তিনি মনে করতেন পলিটিক্যাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় হল নেশন। নেশনের ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'মিথ্যার দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো বলিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে— ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রধান অবলম্বন।' (সমূহ/ বিরোধমূলক আদর্শ)।

'নেশন নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা। তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না।' (সাহিত্যের পথে/ সাহিত্যতত্ত্ব)

অন্যত্র লিখলেন: 'প্যাট্রিয়টিজ্‌ম নামে পদার্থ, ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে, এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই।' (শিক্ষা/আবরণ)।

এমন করেই রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর জন্মদিন ঘটা করে পালন না করে তাঁর রচনার চর্চা করা দরকার। তার থেকে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে আমরা যেন নিশ্চিত ধ্বংস বা বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি। 'আরেক রকম' সেই ভাবনার গোড়ায় জল দিতে চেয়েছে। 'আরেক রকম'-এর উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা

পুনঃপাঠ

এবার গাত্রোত্থান করুন

(*আরেক রকম*, দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা, সম্পাদকীয়)

২০১৪ সালের নির্বাচনে মোদীর ক্ষমতাসীন হওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ভরাডুবি প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, অশোক মিত্র, এই সম্পাদকীয়টি লেখেন। পাঁচ বছর পরে আবার মোদী সরকার ক্ষমতায় আসা এবং রাজ্যে বামপন্থীদের প্রবল বিপর্যয়ের সন্দর্ভে এই সম্পাদকীয়টি আজও প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করছি।

সারা দেশে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল যা অবধারিত বলে আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হয়েছে। কংগ্রেস প্রশাসনের অনুসৃত আর্থিক নানা অনাচারে দেশের সর্বত্র আপামর জনসাধারণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ, একই সঙ্গে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতি, কর্মসংস্থানহীনতা, দরিদ্রতর শ্রেণিভুক্তদের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা। মুক্ত অর্থনীতির প্রকোপে কৃষিতে গভীর সংকট, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার কারণে কোনো-কোনো শিল্প অথবা পরিষেবার ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতির সম্ভাবনা ছিল প্রধানত বাড়তি রপ্তানির ভরসা, তাও ক্রমশ বিলুপ্ত। যদি বিশেষ করে মার্কিন অর্থব্যবস্থার সুস্বাস্থ্য ফিরে আসে তা হলেই আমাদের এখানে তথ্যপ্রযুক্তির মতো শিল্পের সামান্য ভাগ্য ফিরতে পারে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী তো সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তা ছাড়া ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যাপুষ্ট দেশ, বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর করে তেমন বেশি দূর এগোবে তা এক অলীক প্রস্তাব। চীন খানিকটা পেরেছে, কিন্তু সেখানেও রপ্তানির অনুপাত দেশের জাতীয় আয়ের পঁচিশ-তিরিশ শতাংশের বেশি নয়। আর ভেবে দেখা উচিত, চীন যে কর্মনৈপুণ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্যাদি উৎপাদন করে বিদেশের বাজারে থাবা বসাতে পারে, তার ধার-কাছেও আমরা পৌঁছুতে পারব না। যতদিন না আমূল ভূমিসংস্কার ও আর্থিক অসাম্য তথা সামাজিক বৈষম্যকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ তৈরি করা যাচ্ছে, ততদিন দেশে আভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি হবে না, পণ্যাদির চাহিদা যথেষ্ট বাড়বে না, জাতীয় অর্থব্যবস্থা মুখ থুবড়েই থাকবে।

কিন্তু এসব কথা বর্তমানের ঘোর-লাগা মুহূর্তে কে কাকে বোঝাবে? মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণ করে উপর তলার দশ-পনেরো কোটি মানুষ গত কুড়ি বছরে যাঁরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন, তাঁরা ভাবছেন মোদী শক্ত হাতে মুক্ত অর্থনীতি চালু করবেন, তাতেই সকলের স্বপ্ন পূরণ হবে। সংগঠিত শিল্পাদির কর্তাব্যক্তিরা সেরকম চিন্তার জোরালো সমর্থন করেছেন। কংগ্রেস প্রশাসনের কাছ থেকে তাঁরা যত পরিমাণ মদত পেয়েছেন, তার চেয়েও বেশি, বিজেপি প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা তাঁদের চনমনে করে তুলেছে। তাঁরা মধ্যশক্তি নিয়ে এবং তাঁদের বিজ্ঞাপন প্রচারের মস্ত ক্ষমতা নিয়ে মোদীর সমর্থনে কয়েকমাস ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেনসেক্স পঁচিশ হাজার ছুঁয়েছে। শেয়ার বাজার যে আসল অর্থব্যবস্থা নয়, এই মুহূর্তে তাঁরা বিস্মৃত।

অন্যদিকে তিন চতুর্থাংশ বা তারও বেশি দেশবাসী যারা কংগ্রেসি অনাচারে-অত্যাচারে, বিরামহীন মূল্য বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থানের অভাবে গত দশক ধরে হাঁসফাস করছেন তাঁদের অধিকাংশ সমাজের অধস্তন স্তরের মানুষজন, তাঁদের অশিক্ষায় অস্বাস্থ্যে নির্জীব করে রাখা হয়েছে, চেতনার স্তর তাঁদের এখনও অস্ফুট, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন রাজা বদল করলেই তাঁদের কপাল ফিরবে, কংগ্রেসকে খেদিয়ে বিজেপি-কে সুযোগ দিলে হয়তো এই দল সত্যি তাদের সুখের স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছে দেবে। শোষিত-বঞ্চিত দলিতদের একটি অতুচ্ছনীয় অংশ যখন এমন চিন্তা শুরু করলেন দেশের ঐতিহ্যগত যুথবদ্ধতায় তাঁরা আক্রান্ত হলেন। এখনও উত্তর ভারতের রেলস্টেশনে এইরকম দৃশ্য সচরাচর দেখা যায়, কিছু সরল দেহাতি ব্যক্তি ক্ষণেকের জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেনে একটি বিশেষ কামরায় উঠে পড়েন, অন্য সমস্ত দেহাতিরাও সেদিকে ধাবিত হন, অন্য কোনো খালি কামরা তাঁদের নজর পড়ে না।

সেই যূথচারিতাই বিজেপি-কে অভাবিত সাফল্যে পৌঁছে দিয়েছে। গোটা দেশের অধিকাংশ প্রান্তে কংগ্রেসের বিকল্প জাতীয় দল তো বটেই, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও শক্তিভিত্তিক দলও এই দুর্মদ প্রবণতার শিকার হয়েছে। আসন জেতার বিচারে মুলায়ম সিং যাদব-মায়াবতী-লালুপ্রসাদ যাদব-নীতীশকুমারের

মতো তাবড় তাবড় দলও প্রায় নিশ্চিহ্ন। তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের অপকর্মের গভীর সহযোগী ছিল বলে ডিএমকেও ধুয়ে মুছে গেছে। অথচ মজার ব্যাপার অন্ধ্রপ্রদেশকে তেলেঙ্গানা ও সীমান্ধ্রে ভাগ করে কংগ্রেস ভেবেছিল কেল্লা ফতে, সেখানেও তারা দুটি রাজ্যে সমান পর্যুদস্ত। একমাত্র কেরলেই চিরাচরিত কংগ্রেস-বামপন্থীদের দ্বান্দিকতার ঐতিহ্যে চিড় ধরেনি। বিজেপি এখানে এবারও দাঁত ফোটাতে পারেনি। তামিলনাড়ুতে শ্রীমতী জয়ললিতা তাঁর প্রাধান্য আরো বাড়িয়েছেন। উড়িষ্যায় নবীন পট্টনায়কও। তা ছাড়া পশ্চিমবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের অবিশ্বাস্য সাফল্য। এমনকী এই প্রথমবার অসমে পর্যন্ত বিজেপি-র পরাক্রমে কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ।

মোদীর বিজয়-আবির্ভাবে আপাতত শেয়ার বাজার তুঙ্গে, ফাটকাবাজ কিছু পয়সা করছে, বিদেশ থেকে আসছে, সুতরাং বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার স্ফীততর। বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে বলে শিল্প ব্যবসায়ী মহলে মস্ত আশা। তবে অনেক কিছুই নির্ভর করছে নরেন্দ্র মোদী তাঁর দলের হিন্দুত্বওয়ালাদের কতটা সংযত রাখতে পারেন তার উপর। অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০২ সালে গুজরাটের বিভৎস নারকীয় সংখ্যালঘু নিধনলীলার অব্যবহিত পরে মোদীকে যে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এই মুহূর্তে তাই ফের উচ্চারণ করতে হয়, মোদীকে রাজধর্ম পালন করতে হবে, প্রতিটি নাগরিককে সমান চোখে দেখতে হবে, সমান মর্যাদা দিতে হবে। তা না করে হিন্দু উগ্রপন্থীদের উৎসাহ দান করলে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হবে, সর্বত্র দাঙ্গা হাঙ্গামার আশঙ্কা, কাশ্মীরে ফের অনিশ্চয়তার বাতাবরণ, এমনকী পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই ঘাঁটি গেড়ে বসা তালিবানরাও ভারতবর্ষের দিকে তাদের করাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। এরকম পরিস্থিতিতে অর্থব্যবস্থাও ধাক্কা খাবে, কিন্তু বিনিয়োগের সম্ভাবনা সংকুচিত হবে, বিদেশীরা যারা নতুন করে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁরাও ফের পিছু হঠবেন। এটুকু শুধু ঈষৎ ইতিবাচক দিক, শিল্পগোষ্ঠীরাও সম্ভবত নিজেদের স্বার্থের কথা ভাববে, মোদীকে যথাসম্ভব সতর্ক পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করবেন।

গরিব মানুষদের কী হবে? তাঁরা নতুন রাজাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। কিন্তু যে শ্রেণি-স্বার্থান্ধরা কংগ্রেসকে ব্যবহার করেছে, বিজেপি-কেও ব্যবহার করতে তারা বদ্ধপরিকর থাকবে। একমাত্র যদি সমাজচেতনার অধিকার বিকাশ ঘটে তা হলেই শোষিত-বঞ্চিতের দল সংঘবদ্ধ হবার প্রতিভা অর্জন করবে, রাস্তায় নেমে সুগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের নূন্যতম দাবি প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রশাসনকে বাধ্য করবে, তা হলেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। গরিবদের শোষিতদের দলিতদের লড়াই করা শিখতে হবে। লড়াই করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এমন লড়াই গড়ে তুলতে হবে যা শাসকদের ভয় পাইয়ে দেয়, সংযত হতে শেখায়, সংবৃত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে বরাবর এমনটাই হয়েছে। আমাদের দেশে বিকল্প কোনো পন্থা নেই।

এই প্রসঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনি ফলাফল নিয়ে একটু বিশদ আলোচনার নিতান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতারপর দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরা এরকম সুগঠিত লড়াকু আন্দোলনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিবেকাহত সন্তানেরা যেমন এই আন্দোলিত গঠনে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যুক্ত করেছেন, তাঁদেরই প্রাথমিক প্রয়াসে শোষিত কৃষক-ভূমিহীনরা দেশের এখানে ওখানে নিজেদের সুশৃঙ্খল সংগঠিত করতে শিখেছেন, কল কারখানায় শ্রমিকরা ঐক্যের ভিত্তিতে সমান উৎসাহে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। আস্তে আস্তে শ্রমিক শ্রেণির মধ্য থেকে লড়াকু নেতা বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের শ্রেণিস্বার্থ তাঁদের থেকে বেশি কে বুঝবে? সুতরাং আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। অবশ্য এই জোয়ার কখনো দেশের সর্বত্র সমান প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, বিশেষ করে দরিদ্রতর মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক তথা পঙ্‌ক্তিচেতনার প্রগাঢ়তা, চিরাচরিত শ্রেণি-বিভাজন তত্ত্বের উপর ছায়া ফেলেছে, যা বামপন্থীরা দূর করতে এখনও পর্যন্ত অক্ষম। তা হলেও দেশের বেশ কয়েকটি প্রান্তে বামপন্থী প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, বিশেষ করে কেরলে ও পশ্চিম বাংলায়। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি ঘটেছিল পশ্চিম বাংলায়। শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, উদ্‌বাস্তু, প্রভৃতি বিভিন্ন বঞ্চিত শোষিত মানুষদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গঠন করে বামপন্থীরা এই রাজ্যে গত শতকের শেষ তিন দশকে প্রশাসনের ক্ষমতা দখল করতে সফল হয়েছিলেন। ত্যাগে, অধ্যবসায়ে, বিনয়ে, তিতিক্ষায়, আদর্শে তদ্‌গতপ্রাণ নেতা কর্মীরা অনেক পীড়ন সহ্য করেছেন, দীর্ঘকাল বিনা বিচারে কারাকক্ষে রুদ্ধ হয়ে থেকেছেন, নয়তো আত্মগোপন করে শোষিত বঞ্চিতদের রক্ষা করার প্রয়াস চালিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে সংগঠন আরো দৃঢ়বদ্ধ করেছেন, মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তদের শরণার্থীদের সঙ্গে সর্বদা একাত্ম হয়ে থেকেছেন, তাঁদের ঘরের লোক হয়ে গেছেন, তাঁদের সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন।

দৈনন্দিন সমস্যায় জীর্ণ সাধারণ মানুষ বামপন্থীদের আদর্শনিষ্ঠ একাগ্র সংগঠিত বিনয়শ্রদ্ধা ক্রিয়াকর্মে তাঁদের প্রতি মুগ্ধ থেকে মুগ্ধতর হয়েছেন। বামপন্থী পরিবৃত্ত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে, যা সহজেই নির্বাচনে সাফল্য এনে দিয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরা যখন ক্ষমতায় প্রবেশ করলেন তাঁরা সব গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিয়ে রাজ্যে

একটি খোলামেলা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করলেন। সংবিধান রাজ্যগুলির হাতে যথেষ্ট আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করেনি, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কর সংগ্রহের অধিকার কেন্দ্রের কুক্ষিগত। কেন্দ্রের প্রয়োজনবশত নোট ছাপাবার অধিকার আছে, রাজ্যগুলির তা নেই, এমনকী বাজার থেকে রাজ্যগুলি কী পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করতে পারে সেই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের এক্তিয়ারে। প্রশাসনে ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহুতর অসুবিধার পাশাপাশি এই আর্থিক সীমাবদ্ধতাও রাজ্যগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই এক অসহায় উপত্যকায় পৌঁছে দেয়। সমস্তকিছু বিবেচনা করে পশ্চিমবাংলার প্রথম দিকের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি তুলে আন্দোলন গঠনের অঙ্গীকার করেছেন। পাশাপাশি আপাতত থাকবেন, অতি সংকীর্ণ রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা; তার পূর্ণ সদব্যাবহারের মধ্য দিয়ে সরকারি ও সরকারের উপর নির্ভরশীল সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একটু ভদ্রগোছের মাইনেপত্র দেবার জন্য সরকারি তহবিল থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কিন্তু মূল লক্ষ্য রইল গ্রামাঞ্চলে ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ করে অন্য সব রাজ্যের চেয়ে আগে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং পঞ্চায়েতগুলির হাতে পর্যাপ্ত অর্থ পৌঁছে দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষকে স্বশাসনের আস্বাদ পৌঁছে দেওয়া। সীমিত সংস্থানের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে কোনো বড়ো উদ্যোগ নেওয়া বাম সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না, বিশেষ করে যেহেতু দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যাবস্থা তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রধান বিনিয়োগ সংস্থাগুলি কেন্দ্রের অধীন। কিন্তু যেহেতু বর্গাদারদের নিজেদের চাষ করা জমিতে আইনগত অধিকার দেওয়াসহ, ভূমিহীনদের কিছু জমি পাইয়ে দেওয়া— এরকম নানা ধরনের ভূমিসংস্কারের পরে কৃষি উৎপাদনে কিছুটা জোয়ার এল, খেত-মজুরদের উল্লেখযোগ্য মজুরি বৃদ্ধি ঘটল। বামপন্থীদের মূল উদ্দেশ্য যে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও এই একটি বাম প্রশাসন বিশেষ একটি রাজ্যে সুস্বচ্ছ দক্ষ প্রশাসন পরিচালনা করে গোটা দেশের মানুষের কাছে বিকল্প রাজনীতির নিদর্শন রাখবে, যা অবলোকন করে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সাধারণ মানুষ কাতারে কাতারে বামপন্থার দিকে আকৃষ্ট হবে। পাশাপাশি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি তুঙ্গে তুলে সমমনোভাবাপন্ন অন্য কয়েকটি রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় এমন আন্দোলন গড়ে তোলা, যা কেন্দ্রকে কিছু নির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া মানতে বাধ্য করবে।

শুরুটা চমৎকার হয়েছিল। সারাদেশে পশ্চিমবাংলার বাম প্রশাসনের প্রতি সম্ভ্রম বাড়ছিল। রাজ্যের মানুষজনের বাম পন্থার প্রতি প্রচুর অনুরাগ ব্যাপ্ততর ও গভীরতর হচ্ছিল। গত শতকের শেষ দশক থেকে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা দিল, বিশেষ করে প্রধান বামপন্থী দল যাকে বাদ দিয়ে বামফ্রন্টও টিকে থাকা অকল্পনীয়, একধরনের শ্লথতার শিকার হল। নির্বাচনের পর নির্বাচনে এত সাফল্য, এত জনপ্রিয়তা, নিশ্চিন্ত গর্বের হাসি, আস্তে আস্তে সংক্রামিত হল। তা ছাড়া পুরোনো নেতৃবৃন্দ যাঁদের ত্যাগে-তিতিক্ষায়, অধ্যবসায়ে, ধৈর্যে-বিনয়ে দলটি শক্তিশালী হয়েছিল তাঁরা একে একে নিষ্ক্রান্ত হতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের জায়গা জুড়ে বসলেন আন্দোলনের ত্যাগের-সহিষ্ণুতার-বিনয়ের ঐতিহ্যবিহীন নবীন নেতৃবৃন্দ। তাঁরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণিজাত, শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নেই। তাঁরা, দলের পুরোনো দিনের নানা সংকট-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার যে অভিজ্ঞতা তার বিন্দুবিসর্গ জানেন না। দলের দুঃসময় কেটে যাবার পর তাঁরা অনুপ্রবেশ করেছেন, সবাই প্রায় সুখের পায়রা। দলের এত সম্মান ও সমৃদ্ধি তাঁদের মধ্যে এক ধরনের নির্লিপ্ততার জন্ম দিল, সেই সঙ্গে অহমিকারও। অথচ সংগ্রামী অভিজ্ঞতার পর্যাপ্ত বিদ্যাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, সৌজন্যবোধ, প্রভৃতি মানবিক গুণের নিরিখে তাঁরা সম্ভবত অনেকটাই পিছিয়ে। তাঁরা নিজেরা নেতা বনে গিয়ে তাঁদেরই পেটোয়া আরো কয়েকজনকে নেতৃত্বে ডেকে নিলেন যাঁদের মানবিক গুণাবলি তথৈবচ। তাঁরাই সদরে মফস্বলে গ্রামে গঞ্জে দলের নেতৃত্বে নিজেদের পাকাপোক্ত করলেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা-নীতির বিকৃত প্রয়োগে তাঁদের নড়ানো প্রায় অসম্ভব।

পরিণাম যা হবার তাই হল। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট গত শতকের শেষ দশকে যখন অমিত প্রভাবশালী, বাম আন্দোলনের প্রধান খুঁটিই তখন এই রাজ্য। পশ্চিমবাংলার পাশে কেরল, ত্রিপুরা ও অন্যান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে বামপন্থীদের অবশ্যই যথেষ্ট সংগ্রামশীলতা থেকে আহৃত জনপ্রিয়তা, কিন্তু পশ্চিমবাংলাই দেশে বামপন্থার মূল উদ্দীপনার সূত্র।

এখান থেকেই সর্বনাশের সূচনা। রাজ্যের দলনেতারা সংগ্রাম কাকে বলে জানেন না বা ভুলে গেছেন। তাঁরা নিশ্চিন্ত প্রশান্তির মধ্যে দিন যাপন করছেন। কৃষিতে আমূল ভূমি সংস্কারের পর উৎপাদন ও উপার্জন বৃদ্ধির জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে তাঁদের চিন্তা ভাবনা নেই। লড়াই করে কেন্দ্রের কাছ থেকে যথেষ্ট পয়সাকড়ি আদায় করে বড়ো শিল্প গড়বার পরিশ্রমটুকুও তাঁরা করতে রাজি নন। বিশ্বায়নের মোহে তাঁরাও গা ঢাললেন। মার্কসীয় আদর্শের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করে শিল্পে বড়ো পুঁজিপতিদের আহ্বান জানালেন। গুরুবাদের দেশ আমাদের। দলটি বামপন্থী হলেও উপরতলার নেতারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, শাখা উপশাখায় তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্য নেতৃত্বে আন্দোলন বিমুখতা, অহমিকা তথা বিদূষক-প্রশ্রয় দলের সর্বত্র আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও তার বাইরে রইল না। সেখানে দলীয় মাতব্বররা স্বৈরাচারী ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল। এরকম

পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক, কিছু দূরাচারও দলের এখানে ওখানে অনুপ্রবেশ করল।

কিন্তু তার চেয়ে মস্ত ভুল হল সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা স্থাপনের জন্য টাটাদের জমি পাইয়ে দেবার ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের আচরণ। কৃষিজীবীদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা নিয়ে যে জট তা ছাড়াবার অনেক বিকল্প পথ ছিল, কিন্তু নেতারা অন্য কোনো কথা শুনতে রাজি নন। অনুরূপ ব্যাপার ঘটল নন্দীগ্রামে। খানিক সময় বাদে জঙ্গলমহল অঞ্চলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ কয়েকটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে যে বিভৎস অত্যাচার চালাল, তা অচিরে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করল।

দল সরকার-নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সর্বস্তরের নেতারা অধিকাংশই অহমিকায় টং হয়ে আছেন। ক্রমশ বিরক্তির যে পাহাড় জমছিল তা আরো বিরাট আকার ধারণ করল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগটি গ্রহণ করলেন। জনসমর্থনের একটি বড়ো অংশ বামপন্থীদের থেকে দূরে যেতে শুরু করল।

পরের ইতিহাস সংক্ষেপেই বর্ণনা করা যেতে পারে। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ছিল মোট ভোটের ৪৯ শতাংশ, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তা কমে গিয়ে দাঁড়াল ৪৩ শতাংশে। প্রধান বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ অবিচল রইলেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের আচরণ-বিচরণে ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছে, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না, বামপন্থী পরিবৃত্তের আয়তন যে সংকুচিত হচ্ছে তা থেকে কোনো শিক্ষা তাঁরা গ্রহণ করলেন না। অতএব ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোট আরো এক ধাপ নেমে দাঁড়াল ৪১ শতাংশে। বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হল। নেতাদের নির্লিপ্তভাব তাতেও কাটল না, তাঁরা বুঝেও বুঝতে পারলেন না বাম পরিবৃত্তের মধ্যেই তাঁদের সম্বন্ধে গভীর অনাস্থা দেখা দিয়েছে। তাঁরা যতদিন দলে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবেন এবং নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করবেন, ততদিন জনসমর্থন কমতেই থাকবে। দলের অভ্যন্তরেও বিক্ষোভের ঢেউ। কিন্তু দলীয় অনুশাসণের কঠোরতার জন্য অনেকেই মুখ ফুটে স্পষ্ট কথা বলতে পারছিলেন না, যাঁরা পারছিলেন তাঁদের নেতারা সরিয়ে দিলেন দল শুদ্ধিকরণের অজুহাতে। দলকে পরিশুদ্ধ করতে হলে যাঁদের যাওয়া প্রয়োজন তাঁরা কিন্তু থেকে গেলেন; যাঁরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, আদর্শের স্বার্থে, আন্দোলনের স্বার্থে, নেতৃত্বের পুনর্গঠন চাইছিলেন, তাঁরাই বহিষ্কৃত হলেন।

এ বছরের লোকসভা নির্বাচন আরো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল এই নেতারা অপসৃত না হলে বামপন্থী আন্দোলন এই রাজ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভীষণভাবে পিছিয়ে পড়বে। তৃণমূল তিন বছর আগের তুলনায় তাদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত বজায় রাখতে পেরেছে। ৪০ শতাংশেরও কম ভোট পেয়ে রাজ্যের লোকসভা আসনে শতকরা ৮০ টিরও বেশি আসন কবজা করেছে। অন্যপক্ষে বামফ্রন্টেরও ভোট ২০১১ সালের তুলনায় এক ধাক্কায় ১২ শতাংশ কমে মাত্র ২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, কোনোক্রমে দুটি আসন ফ্রন্টের ভাগ্যে জুটেছে। গোটা দক্ষিণবঙ্গে এখন আসনের বিচারে বামফ্রন্ট নিশ্চিহ্ন। অথচ কয়েকবছর আগে পর্যন্ত প্রধান বামফ্রন্ট দলটির এই অঞ্চলে অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

এই শোচনীয় কাহিনির সারমর্ম অতি স্পষ্ট। লোকসভার ফল বেরোবার পর নেতারা কাঁদুনি গাইলেন নির্বাচন কমিশন সন্ত্রাস ঠেকাতে পারেনি, তাই তাঁদের বিপর্যয়। অতি ছেঁদো কথা, তৃণমূলের পক্ষ থেকে যত্র তত্র অবশ্যই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আরো একটু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও মোট ফলের কোনো হেরফের হত না। কারণ বামপন্থী নেতারা তৃণমূলী সন্ত্রাস প্রতিরোধের সাহস হারিয়ে ফেলেছেন, অনুগামীদেরও নির্জীব করে দিয়েছেন, ভয়ে কুঁকড়ে-থাকায় নামিয়ে দিয়েছেন, অনেক কেন্দ্রে বহু বুথে নেতাদেরই নির্দেশে পোলিং এজেন্ট দেওয়া থেকে পর্যন্ত বিরত থেকেছেন। সন্ত্রাস প্রতিহত করতে হলে যারা অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের সংঘবদ্ধ করে লড়াই করার অনুপ্রেরণা তাঁরা জোগানইনি, বরঞ্চ অনেক জেলায় নিচুতলার কর্মীদের কাছে গুটিয়ে থাকবার অনুজ্ঞা পাঠিয়েছেন। অথচ যেখানে যেখানে দল সংগঠিত প্রতিরোধ দিতে সফল হয়েছে সেখানে ভোটের ফল তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো।

অন্য একটি ব্যাপারও আছে। তিন বছর আগেও যাঁরা বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের একটি বড়ো অংশ এবার এমনকী বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা কংগ্রেসি অনাচারে অত্যাচারে নিত্য দগ্ধ হচ্ছেন, দলের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস-বিজেপি উভয় দল থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখা। কিন্তু এই রাজ্যের কোনো কোনো নেতা, নির্বাচনের প্রাক্কালে বলে বসেছেন তেমন তেমন অবস্থা দেখা দিলে বিজেপিকে ঠেকাতে তাঁরা কংগ্রেসকেই সমর্থন করবেন। যে মানুষগুলি দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টকে সমর্থন করে এসেছিলেন এই ভেবে যে কংগ্রেসি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টই রুখে দাঁড়াবে, সেই ফ্রন্টের নেতারাই যদি অত্যাচারী কংগ্রেসকে সমর্থনের ঘোষণা করেন তা হলে এই মানুষগুলি তিক্ত হয়ে যেতে বাধ্য, এতটাই ক্ষিপ্ত যে কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে তারা বিজেপিকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। অন্য পক্ষে এমনকী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ মানুষজনও বামফ্রন্টকে সমর্থন করতে তেমন এগিয়ে আসেননি। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘু বহিরাগতদের তিনি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন— মোদীর এই শাসানির পর মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে অনেক উচ্চগ্রামে প্রতিবাদ জানিয়েছেন; বামন্থীদের প্রতিবাদ একটু বিলম্বেই, একটু মিনমিনে। সংখ্যালঘুরাও তা সম্ভবত বিচারে এনেছেন।

আরো মজার কথা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী বিবিধ ক্রিয়াকর্মে যাঁরা বীতশ্রদ্ধ, তাঁদের মধ্যেও অনেকে যাঁরা আগে বামফ্রন্টকে সমর্থন করতেন, এবার ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছেন— এই ধারণা থেকে যে নরেন্দ্র মোদীর মতো শক্তপোক্ত একজন প্রধানমন্ত্রী মমতাকে ঠান্ডা করতে পারবে, অকর্মণ্য বামপন্থী নেতাদের সেই মুরোদ নেই। এত সর্বনেশে বিপর্যয়ের পরেও বৃহত্তম বাম দলটির নেতৃত্ব এখনও নড়ে চড়ে বসলেন না। তাঁরা নাকি যথাসময়ে নিজেদের মধ্যে ভোটের যথাযথ আলোচনা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যারা পরপর তিনবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, এবং প্রতিবার আগেরবারের চেয়েও খারাপ ফল করেছে তারা অকৃতকার্যতার কারণগুলি খুঁজে বার করতে সমর্থ হবে এটা হাস্যকর।

দলের নেতাদের টিকিয়ে রাখার চেয়ে দলের আদর্শকে টিকিয়ে রাখা, আন্দোলনকে সতেজ করা, গরিব মানুষদের স্বার্থে নিরন্তর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অনেক দলের বেশি জরুরি। দেশের শোষিত দরিদ্রদের স্বার্থে পশ্চিমবাংলার বাম আন্দোলনকে ফের বাঁচিয়ে তুলতে হবে। দলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করব, ঢের হয়েছে, এবার সরে দাঁড়ান, এবার অন্যদের সুযোগ দিন দলটিকে, আদর্শকে, আন্দোলনকে বাঁচাবার। আপনারা প্রস্থান করলে নেতৃত্বে ও নীতি নির্ধারণে শূন্যতার সৃষ্টি হবে এমন ধারণার কারণ নেই। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

ছবি : মিতালি দে

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

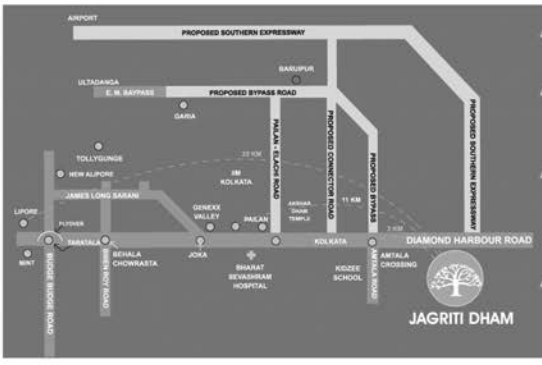

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503

contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Issue date 1 June 2019. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 11 Arek Rakam

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.